ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১৪ রমযান, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ জাহর, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ আগষ্ট, ২০১১ ঈসাব্দ

رمضان کریم

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

মাগফিরাতের দশক–সবার জন্য খুলে যাক জান্নাতের দুয়ার

mPxc Î

আধ্যাত্মিক জীবনে বসন্তকালের সমারোহ নিয়ে আমরা পবিত্র রমযান মাসের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি, আলহামদুলিল্লাহ্! রমযানের দিনরাত ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের অনুশীলন ও চর্চা এ মাসে পবিত্র এক আবহ সৃষ্টি করে মানবীয় প্রকৃতির ওপর এক পরিশুদ্ধ প্রভাবের বিস্তার ঘটায়। সদাচারের পরিচর্যা আর কদাচার পরিহার-এর মাধ্যমে এ মাস ব্যক্তি মানস ও সমাজ জীবনকে পরিশীলিত করে অপরূপ এক অবয়ব দান করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, রোযা সম্পর্কিত নির্দেশ মালা সর্বপ্রথম যখন অবতীর্ণ হয় তখন ছিল গ্রীষ্মকাল আর তাপমাত্রাও ছিল অত্যধিক। তবে তাৎপর্যের দিক থেকে রমযানের মর্যাদা এ থেকে আরও বহু বহু গুণ ব্যপ্ত। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–এ মাসের নাম রমযান এজন্য রাখা হয়েছে কারণ এতে গুনাহ্ জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় (জামে' সগীর)।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন–

রমযান শব্দটিতে উত্তাপ ও দহণের তীব্রতা এবং ভস্মীভূত করে দেবার অর্থ পাওয়া যায়। অতএব এ অর্থে রমযান মাস আমাদের গুনাহ্, নেক কাজে আমাদের অনীহা ও দুর্বলতাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার কার্যকর এক সুযোগ এনে দেয়। আমরা যদি আমাদের নিজেদের আমিত্বকে নিজেদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে একের পর এক সামনে এনে পর্যবেক্ষণ করি আর এক ব্যক্তি যেভাবে উনুনে কোন খাদ্য বস্তু ভুনা করা কালে এর এপিঠ-ওপিঠ বার বার উল্টে-পাল্টে দেখে নেয় যাতে তপ্ত পিঠের বিপরীত পিঠ অভুনা না থাকে।

তেমনিভাবে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলোকে পরখ করে এই রমযান মুবারকেই মানবকে নিজ দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে রমযানের সমীপে উপস্থাপন করা উচিত যাতে তা পরিশুদ্ধ হয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা যদি চিন্তা ভাবনা করেন তবে আপনাদের এমনটাই মনে হবে যে রোযা-র সাথে মানব সর্বদাই নিজ অবস্থানের স্তর অতিক্রম করে চলছে - বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোদার সান্নিধ্য লাভ ঘটছে তার– বিভিন্ন দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা অনুধাবন করে সে তা শুধরিয়ে নিচ্ছে আর আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি ভেঙ্গে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

সামগ্রিক অর্থে নব এক আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিবাহিত হতে থাকবে তার, আর সে একেকটি ধাপ অতিক্রম করে ক্রমেই এগিয়ে চলবে।....আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও আশিসের সাথে আপনি যদি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনার সাথে প্রচেষ্টারত হোন তবে এ মাসে নব এক রূপে আপনার নিষ্ক্রমণ ঘটবে। (খুতবা জুমুআ, ১৫ মার্চ -১৯৯১)

হুযূর (রাহে.) এর দিক দিশারী উল্লিখিত পবিত্র পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে রমযানে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আমাদের সকলের জীবন। আর মাগফিরাতের এই দশকে খোদা তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে রাখুন, আমীন।

১৫ আগষ্ট ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২৭ আগষ্ট ২০১০ইং এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
০৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ইং এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
১১ সেপ্টেম্বর ২০১০ইং এর প্রদত্ত **ঈদুল ফিতরের খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১৭
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার আহমদী বক্তা: শেখ মোজাফ্ফর আহমদ জাফর সদর, মজলিস ওয়াকফে জাদীদ, রাবওয়াহ্।	২৪
পরিত্রাণ লাভে পবিত্র রমযানের শেষ দশক ও ইতিকাফ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৮
সকল প্রকারের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পাবার ঢাল হল রোযা মওলানা জাফর আহমদ	২৯
রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর এনামুল হক রনী	৩১
নবীনদের পাতা– **দোয়া কবুলিয়তের কতিপয় ঘটনাবলী** মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	৩২
সংবাদ	৩৪
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬। রমযান[২০৭ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ[২০৭খ] করা হয়েছে। (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার এ) সংখ্যাপূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার দরুন রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে : (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নি:শেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের ২৪ তারিখে হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিবরাঈল প্রতি বছর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত বাণী রাসূল করীম (সা.) এর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সা.) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে জিবরাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সা.) এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ : (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়। কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এনসাইক্লো-বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন। কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ : ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ : ৪; ১৮ : ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা' 'সফর' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

হাদীস শরীফ

রমযানে সারা বিশ্বের জন্য অনেক দোয়া করা উচিত

কুরআন :

আর যারা তাদের পরে আসলো তারা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সে-সব ভাইকেও (ক্ষমা কর) যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বার বার কৃপাকারী (সূরাতুল হাশর : ১১)

হাদীস :

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সপক্ষে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

আঁ-হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে

ব্যাখ্যা : ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমত: দোয়া হৃদয়ের গহীন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাকে নিজের লোক বলে মনে করি। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম হয়ে থাকে। ইসলাম শুধু কোন ব্যক্তির মুক্তির কথা বলে না বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর। হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ননা করা হয়েছে। আঁ-হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের খোদামুখী হওয়ার, হেদায়াত পাওয়ার বাসনা ও কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এই পবিত্র মাহে রমযানে সারা বিশ্বের জন্য অনেক বেশী দোয়া করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

ধর্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছে

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

হে লোক সকল! তোমরা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখ, দ্বীন-ধর্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছে কিন্তু তোমরা তাকে সনাক্ত করনি, সে তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি ইনিই যিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু তোমাদের চোখের উপর ভারী পর্দা পড়ে আছে। যদি তোমাদের অন্তর সত্যান্বেষী হয়ে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি খোদার সঙ্গে সংলাপের দাবী করে তার সত্যতা যাচাই-বাছাই করা খুবই সহজ বিষয়। তোমরা তার কাছে এসো, তার সাহচর্যে দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান কর যেন, যদি খোদাতাআলা চাহেন তাহেল ঐসব বরকতরাশি যা তার উপরে বর্ষিত হচ্ছে এবং ঐ সব সত্য ওহীর জ্যোতিরাশি যা তার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে সেগুলো হতে কিছু তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পার। যে ব্যক্তি অন্বেষণ করে তাকেই প্রদান করা হয়, যে ব্যক্তি দরজার কড়া নাড়ায় তার জন্যই খোলা হয় তোমরা যদি চক্ষু বন্ধ করে এবং অন্ধকার কুঠরীতে আত্মগোপন করে এই ঘোষণা কর যে, কোথায় সূর্য? তাহলে বৃথা হবে তোমাদের এই অভিযোগ।

হে অজ্ঞ! প্রথমে তুমি তোমার কুঠরীর কপাট খোল এবং নিজ চক্ষু হতে পর্দা সরাও; তাহলে তুমি শুধু সূর্যই দেখতে পাবে না বরং উহা নিজ আলোতে তোমাকে আলোকিত করে দিবে। কেউ কেউ বলে থাকে যে, আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা খুলে দেওয়াই দ্বীন-ধর্মের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারা বুঝে না দ্বীন কাকে বলে? এবং আমাদের জীবনের উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য কী কী এবং কীরূপ এবং কোন কোন পথে ঐ উদ্দেশ্যগুলি লাভ করা যেতে পারে? সুতরাং তাদের জানা দরকার যে, এই জীবনের উৎকৃষ্ট ও পরম উদ্দেশ্য হলো খোদাতাআলার সঙ্গে সত্যিকার এবং নিশ্চিত ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা যা মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তিসুলভ হীন সম্পর্ককে ছিন্ন করে মুক্তির উৎস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

সুতরাং এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাসের পথসমূহ মানুষের কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা কখনও খুলতে পারে না এবং মানুষের গড়া দর্শন ও জ্ঞান এস্থলে কোন উপকার সাধন করতে পারে না। বরং এই জ্যোতি সদা-সর্বদা আল্লাহতাআলা নিজ বিশেষ মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে অন্ধকার যুগে আসমান থেকে নাযিল করে থাকেন। আর যিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হন তিনিই আসমানের দিকে নিয়ে যান। সুতরাং হে লোক সকল! যারা তিমিরের গহ্বরে সমাধিস্থ আছো এবং নানান সংশয় সন্দেহের জিঞ্জিরে বন্দী ও কুপ্রবৃত্তিসুলভ বাসনা-কামনার দাস হয়ে আছো, শুধু নামের ও রসম-রেওয়াজের ইসলামের উপর গৌরব করো না আর তোমাদের সত্যিকার সার্বজনীনতা, তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ এবং তোমাদের পরম সফলতা এসব জাগতিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করো যা সদ্যোজাত আঞ্জুমানসমূহ ও মাদ্রাসাসমূহের মাধ্যমে অবলম্বন করা হয়! এসব কার্য-পদ্ধতি প্রথম পর্যায়ে অবশ্য উপকারজনক বটে এবং উন্নতি ও প্রগতির জন্য সোপানস্বরূপ গণ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে বহু দূরে অবস্থিত। হয়তো এসব তদবীরের ফলে মাথায় কিছু চালাকি ও শঠতা জন্মাতে পারে অথবা স্বভাবে কৌশল ও চাতুর্যের উদ্রেক হতে পারে এবং শুষ্ক দর্শন জ্ঞানের প্রশিক্ষণ লাভ হতে পারে অথবা আলেম ও ফাযিলের উপাধিও লাভ করতে পারে এবং হয়তোবা সুদীর্ঘকাল জ্ঞান লাভ করার পর প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু সাহায্যকারীও হতে পারে। কিন্তু কথায় আছে, "তা তারয়াক্ আয্ ইরাক আওয়ার্দা শোওয়াদ সারে গুযিদা মুর্দা শোওয়াদ"- অর্থাৎ "ইরাক হতে তারয়াক (প্রতিষেধক) আসতে আসতে সর্প-দংশিত মারা গেল"।

অতএব তোমরা জাগ্রত হও, সচেতন হও: এরূপ যেন না হয় যে, তোমাদের পদস্খলন ঘটে, পাছে পরকালের যাত্রা এমন অবস্থায় যেন আরম্ভ না হয় যাকে নাস্তিকতা ও বেঈমানির অবস্থা বলা হয়। নিশ্চিতরূপে বুঝে নাও যে, পরকালের সফলতার আশা-ভরসা এ সকল রসমী বিদ্যা অর্জনের উপর আদৌ নির্ভর করে না বরং সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ অবশ্যই অবতীর্ণ হওয়া দরকার যা সংশয় ও সন্দেহের আবর্জনাসমূহকে দূরীভূত করে প্রবৃত্তির মোহ ও বাসনা কামনার আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং খোদাতাআলার সত্য মহব্বত, সত্য আবেগ ও আসক্তি এবং সত্য আনুগত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যদি তোমরা তোমাদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস কর তাহলে এই উত্তরই পাবে, সত্য প্রশান্তি, সত্য স্বস্তি যা এক মুহূর্তের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করার কারণ হয়, তা তোমরা এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারনি" (ফতেহ ইসলাম, ৪১ পৃঃ)।

অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

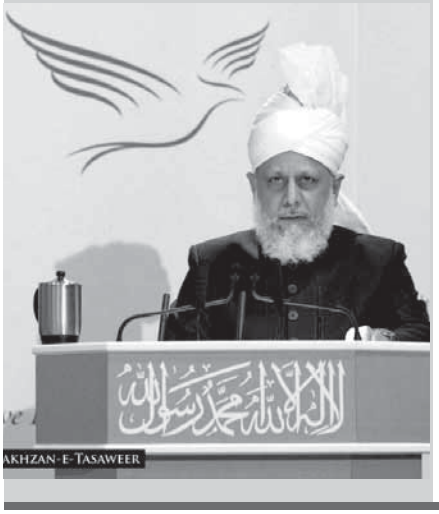

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৭ আগষ্ট, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين * الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * مَالِكِ يَوْمِ الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের যুগই একটি লায়লাতুল ক্বদর হয়ে থাকে

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝

(সূরা আল্ ক্বদর)

এখনই আমি সূরা আল্ ক্বদর পাঠ করলাম আর এর অনুবাদ হল, নিশ্চয় একে আমরা কদরের রাতে অবতীর্ন করেছি। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে, 'ক্বদরের রাত' কী? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিশতারা এবং পবিত্রাত্মা তাদের প্রভু প্রতিপালকের আদেশে অধিক হারে অবতীর্ণ হয়। সব বিষয়ে এক অনাবিল শান্তি এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।

আল্লাহ্ তাআলা চাইলে কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা রমযানের শেষ দশকে পদার্পন করব। যে বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, [রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন] এতে এমন একটি রাত আসে যাকে 'লায়লাতুল ক্বদর' বলা হয়। অর্থাৎ এমন এক রাত যাতে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। যখন তাদের মাঝে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফজল এবং নৈকট্য প্রত্যক্ষ করে। এজন্য রমযানের শেষ দশককে মুসলমানরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সাধারণত এমন অনেকেই আছে যারা নামায, তারাবি এবং অন্যান্য পূণ্যকর্মের প্রতি রমযানের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে মনোযোগী হয় না তারাও তুলনামুলক ভাবে শেষ দশকে এসে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে। জামা'তের মাঝেও এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের এদিকে ঝোক রয়েছে। আর এ দশকে তাহাজ্জুদ এবং নফল নামায আদায়ের প্রতিও তারা বিশেষ মনোযোগী হন। যেভাবে আমি বলেছি, এমনটি করার কারণ বিভিন্ন হাদিস থেকে এটা প্রমানিত ও সুস্পষ্ট হয় যে, এ দশকে এমন একটি রাত আছে যাকে 'লায়লাতুল ক্বদর' বলা হয়। আর এটি এমন রাত যা খুবই গুরুত্ব বহন করে।

কিন্তু আমরা যদি কেবল শেষ দশকের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি আর বাকি সারা বছর এমন কোন প্রচেষ্টা না থাকে তবে এ বিষয়টি কি একজন মানুষকে প্রকৃত মু'মিন ও বান্দা বানাতে সক্ষম হবে? দেখো! অন্য একস্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, জিন ও মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল তাঁর ইবাদাত করা। সুতরাং এক রাত ইবাদাত কর বা এক রাতের সন্ধানে দশ দিন ইবাদত করে নাও তবে তোমাদের সারা জীবনের ইবাদতই সম্পন্ন হয়ে যাবে, এমন কথার ওপর আমল করলে তা এক মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ 'তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদত করা, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিনত থাকা'- এ থেকে দূরে সরিয়ে নিবে।

একটি বর্ণনায় এসেছে, যির্‌রা বিন হুবায়েস বলেন আমি উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভাই ইবনে মাসউদ বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর ইবাদত করবে সে-ই 'লায়লাতুল ক্বদর' পাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন, তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন কেবল একটি রাতের ওপরই নির্ভর না করে। অন্যথায় তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, সে রাত রমযান মাসে আসে এবং রমযানের শেষ দশকে আসে। (মুসলিম কিতাবুস্ সিয়াম, হাদীস নম্বর, ২৭৭৭) সাহাবীরা এ বিষয়ের

গভীর তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন যে, কেবল শেষ দশকের ইবাদতই 'লায়লাতুল ক্বদর' দেখার কারণ হয় না বরং মানুষ যখন রেখে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের প্রতি মনোযোগী হয় তখন খোদা তাআলা চাইলে নিজ বান্দাদের মনস্তুষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে স্বীয় ফযলে ভূষিত করে নিজ নৈকট্যের বহির্প্রকাশের উদ্দেশ্যে সেই অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যাতে তাঁর ইবাদতকারী বান্দা এ বিশেষ রাত লাভ করতে সক্ষম হয় আর এক অদ্ভূত আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা একজন মু'মিনকে তার ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গিকার পূর্ণ করার জন্য একটি বিশেষ রাত রেখেছেন যাতে প্রতি মুহূর্তে একজন মু'মিনের কর্মকান্ডে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং হওয়া উচিতও এবং রমযানের রোযা, কুরআন করিমের তিলাওয়াত ও তা বুঝা আর এ জন্য ইবাদতের মান উন্নত করার চেষ্টা করা যেন রমযানে আমার ইবাদত বন্দেগীর মান আরো উন্নত হয়।

মু'মিন যখন এক বিশেষ প্রচেষ্টা ও আগ্রহের সাথে উচ্চ মান অর্জন করার লক্ষ্যে কোমর বেঁধে লেগে যায় তখন নিজ বান্দার প্রতি পরম দয়াশীল ও নিজ প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণকারী আল্লাহ্ তাআলা যখন দেখেন বান্দা তার সব যোগ্যতা অনুযায়ী এবং তাঁরই আদেশের উপর আমল করে তাঁর এ বাক্য -

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ 'প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে দোয়া করে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই'- সামনে রেখে প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি শুধু তার দোয়া-ই শুনি তা নয় বরং রমযানের শেষ দশকে আমার বান্দাদের জন্য এক মহিমান্বিত রাত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি– তাও দান করি। আকাশ থেকে নেমে বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যাই এবং বলি, আজ রাতে তোমরা যাচনা কর আমি তোমাদের দান করব। সুতরাং বান্দা যখন নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে তখন আল্লাহ্ তাআলাও দোয়া কবুলিয়্যতের বরং আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। নিশ্চয়ই আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী খোদা। কোথাও কোন ঘাটতি থাকলে তা আছে আমাদের কর্ম ও প্রচেষ্টায়।

আল্লাহ্ তাআলা তো প্রতি বছরই রমযান মাস দিয়ে থাকেন, সে মাসে এ দশদিন রাখেন যার মাঝে একটি রাত 'লায়লাতুল ক্বদর' যা বান্দাকে খোদার নৈকট্য দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়। অতএব ভেবে দেখুন! বান্দাকে এ রাতের প্রস্তুতির জন্য কেমন চেষ্টা করা প্রয়োজন? যিনি এই একটি রাত পাবেন তিনি খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যে মর্যাদা লাভ করেন তা তার সারা জীবনের ইবাদতের সমতুল্য। অর্থাৎ এই একটি রাত তার চেহারা বদলে দেয়। সে আর সে থাকে না যা সে পূর্বে ছিল। আর এমন পরিবর্তনই হওয়া উচিত। অন্যথায় এ রাতের প্রাপ্তি আদায় হবে না। এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্যই হল, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা সর্বদাই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।

কেউ যদি মনে করে, আমি 'লায়লাতুল ক্বদর' পেয়েছি যে রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম, কাজেই এখন আমার আর ইবাদাত করার প্রয়োজন নেই, তবে সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার লাভের স্পৃহা এক মু'মিনকে পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্ তাআলার অধিক ইবাদাতকারী এবং তাঁর আদেশ পালনকারী বানায়। অতএব, এ অবস্থা সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ তাআলার কল্যানের ধারা বইতে শুরু করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের দোয়া শুনব। তোমরা আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছ, সামনে পা বাড়িয়েছ, কঠোর প্রচেষ্টা করেছ, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করেছ। এখন তোমরা এ আমল জারি রাখলে আমিও তোমাদের কল্যাণমন্ডিত করতে থাকব। অর্থাৎ রমযানে বান্দা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করবে তখন খোদা তাআলা তাকে লায়লাতুল ক্বদরের দৃশ্য দেখিয়ে নিজের নিকটবর্তী করতে থাকবেন। একজন মু'মিনের নিজের সত্তার জন্য লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে একস্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "লায়লাতুল ক্বদর মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পবিত্র করণের সময়।" (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬)

অর্থাৎ সে যখন পুরোপুরি পবিত্র হয় আর (বিশ্বস্ততার সাথে) আল্লাহ্ তাআলার আদেশসমূহের মান্যকারী হতে প্রয়াসী হয়। এহেন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা-ই লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করে তুলে। আর রমযানের মাস এরূপ আধ্যাত্মিক বিপব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এসে থাকে। আমরা যদি এর মর্যাদা দেই তবে লায়লাতুল ক্বদর পাব এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত হব।

যেভাবে আমি একটি হাদিস বর্ননা করেছি, রমযানের শেষ দশকে 'লায়লাতুল ক্বদর' অন্বেষণ কর।

এ বিষয়ে আমি আরো কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করছি যাতে এই শেষ দশকের গুরুত্ব এবং নবী করীম (সা.)-এর বিশেষ গুরুত্বারোপ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি (সা.) কতটা গুরুত্ব দিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হলে নবী করীম (সা.) কোমর বেঁধে নামতেন এবং সারা রাত জেগে থাকতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২০২৪)

অর্থাৎ ঘুম খুব কম হত, ঘুমাতেন বটে তবে কম এবং নিজ গৃহের সবাইকে জাগাতেন। অতএব, এ হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট যে, শেষ দশকে মহানবী (সা.) স্বয়ং পূর্বের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ইবাদত করতেন। যদিও রাসূলে করীম (সা.)-এর সাধারণ দিনগুলোর ইবাদতের ব্যাপ্তি ও সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তো আমরা ধারণা-ও করতে পারি না। (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদিস নং-২৪৯৫০)

হযরত আয়েশা (রা.) একবার এ উত্তরও দিয়েছিলেন। কাজেই এ দশকে কী অবস্থা হতো! এটা তো কল্পনাও করা যায় না। আর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ফযল ও কল্যাণের যে বারিধারা হতো বা এ দশকে আল্লাহ্ তাআলার ফযলের যে বারিধারা বর্ষিত হয় সে বিষয়ে নবী করীম (সা.) সবচেয়ে ভাল জানতেন। অতএব, তিনি (সা.) এটা কিভাবে সহ্য করতে পারবেন যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ থেকে বঞ্চিত থাকবে? তাই তিনি (আ.) তাদেরকেও জাগিয়ে দিতেন ফলে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি হতো এর অনুমান করাও অ-ভাবনীয়। সুতরাং নবী করীম (সা.) আমাদের জন্য এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও সৌভাগ্য দিন, আমরাও যেন আমাদের এবং আমাদের পরিবারের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

এ অবস্থা যখন আমরা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করব তখন এটি আমাদের ক্ষমা লাভেরও কারণ হবে। আর আমরা প্রকৃত মু'মিন বলে পরিগনিত হব। এ বিষয়ের আরও কয়েকটি হাদিস আমি উপস্থাপন করছি-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের তাড়নায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরে ঈমানী উদ্দীপনায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাতে উঠবে তার পূর্বে কৃত সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদিস নং-২০১৪)

সুতরাং রমযানের রোযাও ঈমানে দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। অন্যথায় ক্ষুধার্ত থাকা আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর লায়লাতুল ক্বদরও খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কেবল জাগতিক স্বার্থে যেমন, লায়লাতুল ক্বদর পেলে আমি দোয়া করব, আমার যেন জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হয়, এমনটি নয়। নেকী লাভের চেষ্টা করা উচিত। বরং দোয়ার মাঝে সর্বাগ্রে যেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি থাকে। এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মহানবী (সা.) এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন,

এটি হুরাইসের ছেলে উকবা বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন. আমি আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-র কাছে শুনেছি তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) বলেন, তোমরা তা শেষ দশকে অন্বেষণ কর। (তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লায়লাতুল ক্বদর)। তোমাদের কেউ যদি দূর্বল অথবা অপারগ হয় তবে সে যেন কোন ভাবেই শেষ সাত রাতে অপারগ না হয়। (সহীহ্ মুসলিম, হাদিস নং-২৭৬৫)

অতএব, দেখুন! কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কোন কারণে রমযান থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে না পারলেও তুমি যদি প্রকৃত মু'মিন হবার আশা রাখ তবে এ দশক অথবা সাত দিনে সকল দূর্বলতা দূরে ছুঁড়ে ফেল এবং নিজের রাতগুলোকে খোদা তাআলার ইবাদতে এভাবে অতিবাহিত কর যাকে প্রকৃত ইবাদত বলা হয়, যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রচেষ্টাই তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য এনে দিবে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বলেন, তার পিতা সাহাবী ছিলেন (রা.) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, তোমাদের কতককে তা (শেষ দশকের) প্রথম সাত রাতে দেখানো হয়েছে এবং তোমাদের কতককে শেষ সাত রাতে দেখানো হয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৪)

সুতরাং এ হাদিসের মাধ্যমে প্রথম হাদীসটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেবল শেষ সাত রাত নয় বরং শেষ দশ রাত, কেননা এর জন্য নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। হতে পারে কিছু সাহাবা (শেষ দশকের) প্রথম সাত রাতে দেখেছেন আর কিছু সাহাবা শেষ সাত রমযানে দেখেছেন। কিন্তু হাদিসে এও পাওয়া যায় যে, বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৩)

যাইহোক, যিনি-ই দেখে থাকুক না কেন এতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফযল রয়েছে। যেভাবে আমি পূর্বে উলেখ করেছি, লায়লাতুল ক্বদর অতিবাহিত করার পর এর মূল্যায়ন করাও আবশ্যক। আর তা হবে এভাবে যে, মানুষের মাঝে যেন এমন পরিবর্তন সাধিত হয় যা সর্বদাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায় এবং বৃদ্ধি পায়। যে সব কথা আমি বললাম, এটি লায়লাতুল ক্বদরের একটি দিক, হাদীস অনুযায়ী যাতে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় দিনগুলোতে খোদা তাআলার বিশেষ ফযল বর্ষণের এক রাতের কথা উলেখ রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন করীম বলে, যেভাবে আমি সূরা আল ক্বদর তেলাওয়াত করেছি, "হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম"। আর হাজার মাসে ৮৩ বছরেরও বেশি প্রায়। অর্থাৎ এ রাত পাওয়া গেলে মানুষের সমস্ত জীবনের দোয়াসমূহ (যা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে এক মু'মিনের জন্য কল্যাণকর) তা কবুল হয়ে যায়। মানুষ অনেক ধরনের দোয়া করে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে সবগুলো উত্তম মনে হয় না।

মু'মিন যখন একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করেন যা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম বিবেচিত হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার মঙ্গলের বিষয় দৃষ্টিতে রাখে তার জন্য সে দোয়া কবুল করেন। অথবা মু'মিন সে মর্যাদা লাভ করে যা তার আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাকে উন্নীত করে। ফিরিশতার অবতীর্ণ হওয়া মু'মিনের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপব সাধনের কারণ হয়ে থাকে। আর এক রাতের ইবাদত সারাজীবনের ইবাদাতের বরাবর হয়ে যায়। কেননা সে তার জন্মের উদ্দেশ্য লাভ করেছে। যেভাবে আমি বলেছি, একবার যখন পেয়ে যায় তখন একজন মু'মিন তা পেতে থাকার উদ্দেশ্যে সন্ধান ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

সুতরাং এ রাতটি এক মু'মিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। কিন্তু এটি আরও বিস্তৃত অর্থ বহন করে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, এ সূরায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ আমরা তাকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। কোন্ জিনিসকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছেন? তা হল এই পরিপূর্ণ শরিয়ত যা কুরআন আকারে আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। এটি এক দিকে রমযানে কুরআন করিমের অবতীর্ণ হবার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেভাবে কুরআন করিমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থাৎ রমযান মাসে কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর এ রমযানে সেই 'লায়লাতুল ক্বদর' রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী, হাদীস নং-৪৯৯৭)

সুতরাং সার কথা হল, রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে। আর যেভাবে হাদিস থেকে জানা যায়, এ মাসে জিবরাইল (আ.) রাসূলে করীম (সা.)-কে এর পুনরাবৃত্তি করাতেন।

অতএব, এর এও চাহিদা যে, যুগের প্রয়োজন এ বিষয়ের প্রত্যাশী ছিল যেন কোন পরিপূর্ন হেদায়েত অবতীর্ণ হয়; কেননা তা ছিল এক অন্ধকার যুগ। যেভাবে কুরআনে করিমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"জাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহার"** অর্থাৎ জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেই বিশৃঙ্খলার যুগের চাহিদা ছিল যেন হেদায়েত আসে। আল্লাহ্ তাআলা এ যুগের এ গুরুত্বের কারণে অর্থাৎ জলে-স্থলে যে বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যার দৃষ্টান্ত অতীতেও ছিল না আর পরবর্তী যুগেও পাওয়া যায় না। কাজেই পরিপূর্ণ হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল। অতএব, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এ পরিপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন করীমের অপর এক স্থানে এর উলেখ পাওয়া যায়। সূরা দুখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

حٰمٓ ۝ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থ ঃ অতিব প্রশংসিত এবং সম্মানের অধিকারী। হামীম এর অর্থ হল অতিব প্রশংসিত এবং সম্মানের অধিকারী। এ স্পষ্ট কিতাবের কসম, নিশ্চয়ই আমরা একে অতীব বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। সর্বদাই আমরা (বিপথগামীদের) সতর্ক করে আসছি। এই (রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাদের আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমরাই রাসূল প্রেরণ করে থাকি। তোমার প্রভূ-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞানী। (সূরা আদ্ দুখান, ২-৭)

সুতরাং এই বরকতময় যুগ এবং বরকতময়

রাত যার মাঝে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট, আলোকিত এবং হেদায়াতেপূর্ণ কিতাব এই পরিপূর্ণ মানবের উপর অবতীর্ন করেছেন যিনি মানব সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যিনি চাইতেন, মূর্তি পুজার পরিবর্তে বান্দা যেন তার সৃষ্টিকর্তার সামনে বিনয়াবনত হয়। যিনি চাইতেন, বান্দা যেন এক অধম মানুষকে আল্লাহ্‌র পুত্র বানিয়ে তার মৃত্যুকে নিজের মুক্তির মাধ্যম বানানোর পরিবর্তে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমার আধার মনে করে। সেই পরিপূর্ণ রাসূল (সা.) চাইতেন, মানুষ যেন অত্যাচার থেকে পরিত্রান লাভ করে। যেখানে খোদা তাআলার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা হয় সেখানে যেন খোদার বান্দার অধিকারও সংরক্ষিত হয়।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এ পরিপূর্ণ মানবের দোয়া শুনেছেন এবং পরিপূর্ণ মানবের ওপর পরিপূর্ণ শরিয়ত কুরআন করীম অবতীর্ণ করছেন। সেই পরিপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করছেন যা শুধুমাত্র চৌদ্দশত বছর পূর্বের অন্ধকার যুগে হেদায়াতের কারণ হয়নি বরং এ পরিপূর্ণ কিতাব এখন কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সব ধরণের আধার দূরীকরণের কারণ হয়েছে। আর এই রাসূল এখন কেয়ামত পর্যন্ত খাতামূল আম্বিয়া এবং শেষ শরিয়তধারী নবী থাকবেন।

আর যখনই আল্লাহ্ তাআলার উৎকণ্ঠিত বান্দারা যুগের ইতিহাস দেখে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে অবনত হবে এবং চিৎকার করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা **ইন্নাহু হুওয়াস সামিউল আলীম** (অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনিই অতীব শ্রবনকারী এবং সর্বজ্ঞাতা)-এর বাণী পূর্ণ করার মাধ্যমে বান্দাদের সান্ত্বনার উপকরণ সৃষ্টি করেন ও করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে তাঁর অঙ্গিকার এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর সত্যিকার প্রেমিককে তাঁর (সা.) দাসত্বে প্রেরণ করেছেন। এই প্রকৃত দাস এবং মসীহ্ ও মাহদী একস্থানে লায়লাতুল ক্বদরের যে তফসীর করেছেন তা আমি এখন বর্ণনা করছি।

তিনি বলেন, যা সূরা আল্ ক্বদরের মর্মার্থ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলে একটি নিশ্চিত যে সূক্ষতত্ত্ব জানা যায় তা হল, খোদা তাআলা এ সূরায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, পৃথিবীতে যখন কোন ঐশী সংশোধনকারী আসেন তখন তাঁর সাথে আকাশ থেকে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে অপেক্ষমান লোকদেরকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হতে এ নতুন কল্যাণ অর্জিত হয় যে, চরম পথভ্রষ্টতা এবং অবহেলার যুগে যদি একবার, অলৌকিক ভাবে মানুষের শক্তির মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধর্মের অণুসন্ধানের প্রতি গতির সঞ্চার হওয়া শুরু হয়ে যায় তবে তা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করবে যে, কোন ঐশী সংশোধনকারীর জন্ম হয়েছে। কেননা রুহুল কুদুসের অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এমন গতি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব। আর এ গতি যোগ্যতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ধরণের হয়ে থাকে। হরকতে তাম্মাহ (পূর্ণাঙ্গিন গতি) এবং হরকতে নাকেসা (অপূর্ণাঙ্গিন গতি)। হরকতে তাম্মাহ হল সেই গতি যা আত্মার মাঝে পরিচ্ছন্নতা ও সরলতা দান করে এবং চিন্তা-চেতনাকে তীক্ষ্ণ করে সত্য-মূখী করে।

আর হরকতে নাকেসা হল সেই গতি যা রুহুল কুদুসের আন্দোলনের ফলে চিন্তা-চেতনা কিছুটা তো ক্রিয়াশীল হয় কিন্তু যোগ্যতা ও নিষ্ঠার অভাবের জন্য তা সত্যাভিমূখী হতে পারে না বরং সে এ আয়াতের সত্যায়নকারী হয়ে যায়, فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা গতিশীল হওয়ার ফলে তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় জঘন্য হয়ে যায়। যেভাবে সকল নবীদের যুগে এমনই ঘটেছে অর্থাৎ তাদের আবির্ভাবের সাথে যখন ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয়েছে তখন ফিরিশতাদের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনে প্রত্যেক প্রকৃতি সাধারণ ভাবে আন্দোলিত হয়েছে। তখন পূণ্যবানদের সন্তানেরা সেই সব পূণ্যবানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর দুষ্ট ও শয়তানের বংশধররা সেই আন্দোলনের ফলে অবহেলার স্বপ্ন থেকে তো জাগ্রত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগীও হয়েছে কিন্তু সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারেনি। সুতরাং ঐশী সংস্কারকের সাথে অবতীর্ণ ফিরিশতাদের ক্রিয়া প্রত্যেক মানুষের ওপরই সক্রিয় হয় । কিন্তু এ ক্রিয়ার ফলে পুন্যবানদের ওপর উত্তম প্রভাব এবং দুষ্টদের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে।..... যেভাবে এখনই আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি, فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا এ পবিত্র আয়াতটি এই বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

হুযূর (আ.) বলেন, এ কথাটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সময় একটি লায়লাতুল ক্বদর হয়ে থাকে। যার মাঝে সেই নবী এবং কিতাব যা তাঁকে দেয়া হয়েছে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় আর ফিরিশতারাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় লায়লাতুল ক্বদর সেটি যা আমাদের নবী (সা.) কে দেয়া হয়েছে। মোটকথা সেই লায়লাতুল ক্বদরের আঁচল মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর মানুষের আত্মিক ও চিন্তা শক্তির যে ক্রিয়া নবী করীম (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হচ্ছে তা লায়লাতুল ক্বদরের প্রভাবেই হচ্ছে। শুধু পার্থক্য হল, সেই ক্রিয়া ভাগ্যবান লোকদের চিন্তা শক্তির মাঝে পূর্ণ ও দৃঢ়ভাবে হয়ে থাকে।

আর হতভাগ্য লোকদের চিন্তাশক্তি বক্রতা এবং দৃঢ়তাহীণ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে যখন নবী করীম (সা.)-এর কোন প্রতিনিধি জন্মগ্রহণ করে তখন এ ক্রিয়া অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে নিজ কর্ম সম্পাদন করে। বরং সে প্রতিনিধি মাতৃগর্ভে আসের যুগ থেকেই গুপ্তভাবে মানবিয় শক্তি কিছুটা ক্রিয়াশীল হওয়া শুরু করে এবং তাদের মাঝে যোগ্যতা অনুযায়ী একটি গতির সঞ্চার হয়। আর সে প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব লাভের সময় সেই ক্রিয়া অত্যন্ত গতিশীল হয়ে যায়।

সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধির আবির্ভাবের সময় যে লায়লাতুল ক্বদর নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূলত সেই লায়লাতুল কদরেরই একটি শাখা। অথবা এভাবে বলতে পারি যে, নবী করীম (সা.) যা পেয়েছেন এটি তার প্রতিবিম্ব। আল্লাহ্ তাআলা এ লায়লাতুল ক্বদরের মর্যাদা অতি উচ্চ করেছেন। যেভাবে এর স্বপক্ষে কুরআন করীমের এ আয়াত রয়েছে, فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এ লায়লাতুল ক্বদরের যুগে সকল প্রকার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের বিষয় পৃথিবীতে প্রকাশ করা হবে। আর বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গুপ্ত বিষয়গুলোকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে ধরাপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়া হবে। আর মানবীয় শক্তির মাঝে এর বিভিন্ন যোগ্যতা ও ধরণ অনুযায়ী বিকাশযোগ্য যে দক্ষতা সুপ্ত রয়েছে বা যতটা উন্নতি করতে সক্ষম তার সবটাই প্রকাশ করা হবে। কিন্তু নবী করীম (সা.) এর কোন প্রতিনিধি যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে তখন এ সব বিষয় অত্যন্ত জোড়ালভাবে ক্রিয়াশীল হতে থাকবে।

মূলতঃ এ আয়াতটিকেই সূরাতুল যিলযাল-এ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সূরাতুল যিলযালের পূর্বে সূরাতুল ক্বদর অবতীর্ণ করে এটি সুস্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সুন্নত এ নিয়মেই চলছে যে, আল্লাহ্ তাআলার কালাম লায়লাতুল ক্বদরেই অবতীর্ণ

হয় এবং তাঁর নবীও পৃথিবীতে লায়লাতুল কদরেই আবির্ভূত হন। আর লায়লাতুল কৃদরেই ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয় যাদের মাধ্যমে জগতে পুণ্যের দিকে গতির সঞ্চার হয় আর তারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকার রাত থেকে শুরু করে উষার উদয় পর্যন্ত (সত্য গ্রহণের জন্য) প্রস্তুত হৃদয়গুলোকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার কাজেই নিয়োজিত থাকে। (ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬০)

অতএব এই হল চমৎকার সেই ব্যাখ্যা যার উলেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পুস্তকে করেছেন, যেভাবে আমি বলেছি। এটি একটি উদাহরণ। বিশ্ববাসী, বিশেষ করে মুসলমানরা যদি এ বিষয়টি বুঝতে পারে তবে তারা খোদা তাআলার এ প্রতিনিধির বিরোধীতার পরিবর্তে তার সাহায্যকারী হয়ে যাবে। তিনি যে দলিল উপস্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত জোরালো দলিল। যে সব লোক বলে, আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই, যুগের সংশোধনের জন্য একজন সংশোধনকারীর অন্বেষণ করছি, অথবা হাদীসে বর্ণিত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর যুগের চিহ্ন অনুযায়ী মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের জন্য অপেক্ষমান তাদের জন্য এ কথাগুলো মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। এমন লোকদের উচিত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর এ কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি পড়লাম তাতে এ কথাগুলোও আছে যে,"'চরম পথভ্রষ্টতা এবং অবহেলার যুগে যদি একবার অলৌকিক ভাবে মানুষের শক্তির মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধর্মের অণুসন্ধানের প্রতি গতির সঞ্চার হওয়া শুরু হলে তা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করবে যে, কোন ঐশী সংশোধনকারীর জন্ম হয়েছে। কেননা রুহুল কুদুসের অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এমন গতি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগের সমসাময়িক আলেম এবং নেক লোকদের লেখা পড়লে ও তাদের কথা শুনলে দেখবেন, সবই এর সাক্ষ্য বহন করছে যে, এটা মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের যুগ, তারা মসীহ্‌র আগমনের অপেক্ষায় কারও জন্য প্রতিক্ষারত ছিল। কিন্তু যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দাবী করলেন তখন তাদের মধ্য থেকেই একটি শ্রেণী তাঁর বিরোধিতা করা শুরু করল। আর অনেকেই তাদের ইহকাল ও পরকালকে সুসজ্জিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করল। আর অনেকেই এমন ছিলেন যারা তাদের ইহকাল এবং পরকাল সুন্দর করার উপকরণ সংগ্রহ করলেন। মানুষের মাঝে আজও এ উদ্বেগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠে থাকে, কখনো কখনো পত্রিকায় বিবৃতি আসে, কোন মসীহ্‌র প্রয়োজন; কেউ বলে, মুসলমানদের সংগঠিত করতে খিলাফতের প্রয়োজন। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ না আসা পর্যন্ত খেলাফত কিভাবে জারি থাকতে পারে? এসব কথা, যা কিছু হচ্ছে বা বিবৃতি দেয়া হচ্ছে অথবা মানুষের উপলব্ধি এ কথারই প্রমান বহন করে যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগমনকারী এসে গেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ দলিল-ই দিয়েছেন। তাইতো মানুষের হৃদয়ে এ সব আন্দোলন জন্ম নিয়েছে।

হুযূর (আ.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি আসেন তখন দুই ধরনের গতির সঞ্চার হয়, পূর্ণাঙ্গিন গতি ও অপূর্ণাঙ্গিন গতি। একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গিণ গতি এবং অপরটি দূর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ গতি। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গিন গতির মাধ্যমে আত্মা পরিচ্ছন্ন হয়। খোদা তাআলার কাছে সঠিক পথের দিশা চাওয়া হয় আর আল্লাহ্ তাআলা পথ দেখান। জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষ সত্যকে চিনে নেয়। কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতেই সেগুলোকে ইশারা মনে করে সত্যকে সনাক্ত করে নেয়। এমনিতেও অনেক পূণ্য আত্মাকে আল্লাহ্ তাআলা পথ দেখিয়ে দেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে এমন সরলমনা মানুষ যাদের হৃদয়ে পুন্য ছিল, যারা তাদের চিন্তা চেতনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে তারা তাঁকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আবু জেহেলের মত লোকেরা যারা নিজেরাই নিজেদের বিচক্ষণ মনে করতো তারা বঞ্চিত থেকেছে এবং ধ্বংস হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও হযরত মাওলানা হেকিম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথা ধরুন, হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতিফ (রা.)-এর কথা ধরুন। এ সব লোক দূরবর্তী স্থানে থেকেও সমস্ত দূরত্বকে দূরীভূত করে তাঁর চরণে স্থান করে নিয়েছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আর মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর মত লোক যে কাছে ছিল, যে বাল্য বন্ধু ছিল সে শত্রুতা বশতঃ বঞ্চিত হল। এ সব বঞ্চিত লোকদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারে না। সুতরাং তাদের যোগ্যতা নেকী এবং সত্য গ্রহণের সামর্থই রাখে না। তাদের হৃদয় বক্র হয়ে থাকে, হৃদয়ে অহংকার থাকে এবং স্বার্থপর হয়ে থাকে তাই আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে সাহায্য করেন না এবং পথ দেখান না। বরং তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হুযূর (আ.) বলেন,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

অর্থাৎ এমন লোকদের চিন্তা চেতনা ইতিবাচক দিকের পরিবর্তে নেতিবাচকের দিকে ধাবিত হয়। আর এ নেতিবাচক চিন্তার কারণে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অস্বীকারকারীদের একই অবস্থা। তারা নিজেদের মন মতো নেকীর কথা বললেও এ সব নেকীর কথা কোন প্রভাব বিস্তার করে না। কেন করে না? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিরোধিতার কারণে এবং আল্লাহ্ তাআলার নিয়তিও এর কুফল সৃষ্টি করেন। যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধির বিরোধিতা করা হয় তখন মুখে ভাল কথারও কোন প্রভাব থাকে না, নিঃসন্দেহে মন্দ কথা থাকে। তাদের কথায় কোন আধ্যাত্মিকতা থাকে না। তাদের প্রতিটি কথা প্রমাণশূণ্য হয়ে থাকে।

আল ফজল ইন্টারন্যাশনালে তাহের নাদিম সাহেব আরবদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। এবারও আল ফজলে তাহের হানী সাহেব যিনি আমাদের আরবের অধিবাসী এবং ওয়াকেফে জীন্দেগী আর আরবী ডেস্কে অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করে থাকেন। তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তার মৌখিক বর্ণনা হচ্ছিল। হানী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আমার চেষ্টা থাকত, আমি যেন আহমদীয়াত প্রতিরোধ ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে সব ধরণের সাহায্য পাই ও অস্ত্র ব্যবহার করি। কিন্তু, কয়েকটি বই পড়ার পর তিনি প্রমাণের জন্য এক আলেমের কাছে গেলেন। তার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি এতটাই জ্ঞানী ছিল যে, সে এক মুহূর্তের মধ্যেই হযতর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি বা জামা'তের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমানের খন্ডন করতে সক্ষম বা তার মাঝে এমন যোগ্যতা আছে যার মাধ্যমে সে খন্ডন করতে পারে। তিনি বলেন, আমি কয়েক দিন যেতে থাকলাম এবং তাকে পড়ার জন্য বইও দিলাম, সেই আলেম সব কিছু পড়ার পর কোন যৌক্তিক, কুরআন বা হাদীসের ভিত্তিতে এর বিপক্ষে দলিল দেবার পরিবর্তে বা তা খন্ডন করার পরিবর্তে কেবল এতটুকুই বলতেন, দেখ তো! এ কিতাবে কেমন কাঁচা কথা লেখা হয়েছে, এ সব অযথা কিসব কথা লেখা হয়েছে। একই

ভাবে তিনি বলেন, একবার মোস্তফা সাবেত সাহেবের সথে আমি তার মোনাযেরা করিয়ে দিলাম কিন্ত সেখানেও সারাটা রাত অপচয় ছাড়া তিনি আর কিছুই করেন নি। অবশেষে তিনি এ নামসর্বস্ব আলেমকে পরিত্যাগ করলেন যাকে তিনি অনেক বড় আলেম মনে করতেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ আগষ্ট থেকে ২সেপ্টেম্বর ২০১০ইং পৃষ্ঠা ৩-৪)

অতএব, ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধির যুগে এ সব ধর্মীয় আলেমদের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ শেষ হয়ে যায়। আর আমি যেভাবে বলেছি, বিরোধিতার কারণে আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে যায় তখন ধর্মীয় জ্ঞানও থাকে না এবং থাকতে পারে না। কেননা এটি খোদাভীতি ও আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে এসে থাকে। যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিতের বিরোধিতা শুরু হয় তখন খোদভীতিও শেষ হয়ে যায়। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, পূণ্যবানদের সন্তানেরা সেই সব পূণ্যবানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর দুষ্ট ও শয়তানের বংশধররা সেই আন্দোলনের ফলে অবহেলার স্বপ্ন থেকে তো জাগ্রত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগীও হয়েছে কিন্তু সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারেনি।

সুতরাং আজও আমরা দেখছি, ধর্মের প্রতি অনুরাগের দাবি আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনার অভাবে ধর্মের নামে শুধু শয়তানী কাজ রয়েছে। আজ যদি আপনারা অনুসন্ধান করেন তবে দেখবেন এসব লোকেরাই ধর্মের নামে হত্যা করছে। আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতিটি পড়েছি তাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লায়লাতুল ক্বদরের আলোকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন আর তা হল, নবী করীম (সা.) কে প্রকৃত লায়লাতুল ক্বদর পদান করা হয়েছে। আর এ লায়লাতুল ক্বদরের যুগ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এরই ফলে পুন্যবান সহজ সরল পথের দিকে আসছে। আজও সেই লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণ জারি রয়েছে যা নেকী এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নতির কারণ হচ্ছে। কিন্তু যারা হতভাগা ও দুর্ভাগা তারা সঠিক পথ থেকে সরে আছে এবং সরে যাচ্ছে, শয়তানের বংশধরে পরিনত হচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হতে চলেছে।

নবী করীম (সা.)-এর লায়লাতুল ক্বদরের যুগ তাঁর প্রতিনিধি এবং মসীহ মাওউদের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি, এ যুগের লায়লাতুল কদরের মর্যাদা করে এবং চেনার মাধ্যমে আমরা লায়লাতুল ক্বদরকে পেতে পারি। সুতরাং মানুষের অবস্থা ধর্মের প্রতি সঠিক হওয়া এবং সরল প্রকৃতির হয়ে কল্যাণমন্ডিত হওয়া অথবা নিজ ধ্যান ধারণায় ধর্মের ঠিকাদার সেজে ধর্মের নামে অত্যাচার ও বর্বরোচিত কর্ম করা এবং খুন করা একই ভাবে বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্তৃতি লাভ, এর কতক আবিষ্কার বর্তমানে মানুষের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাকে পদদলিত করার মাধ্যম হিসেবে আর কিছু আবিষ্কার এমনও রয়েছে যা মু'মিনদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। যা খোদা তাআলার বাণী, জ্ঞান এবং কল্যাণ বিস্তারের মাধ্যম হচ্ছে। এ সব ইতিবাচক ও নেতিবাচক কথা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত ব্যক্তির আগমন এবং লায়লাতুল ক্বদর সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ফিরিশতাদের অবতরণের ধারা ঊষার উদয় পর্যন্ত চলতে থাকে। নবী করীম (সা.)-এর যুগ লায়লাতুল ক্বদরের সেই বিশেষ যুগ ছিল যখন ফিরিশতারা প্রশান্তি নিয়ে আগমন করতে থাকে এমনকি তাঁর (সা.) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় হলে, তিনি সফলতা দেখেছেন, বিজয় দেখেছেন। ইসলামের বিজয় হল। এটি ছিল ঊষার উদয়। সে যুগ তো আর পুণরায় আসতে পারে না। যখন দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত পূর্ণ হয়েছে, পরিপূর্ণ শরিয়ত কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে; অতএব, সে এক যুগ ছিল যা গত হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, রাসূলের প্রতিনিধির যুগে তা প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রকাশিত থাকে। মহানবী (সা.)-এর পর খিলাফতে রাশেদার যুগে এ আলোকিত প্রভাত ত্রিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এর পর ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া শুরু হল এবং পরিপূর্ণ অন্ধকার যুগ চলে এলো যা নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। অতঃপর তাঁর প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাবের সাথে রূপক লায়লাতুল কদরের এক নতুন যুগের সূচনা হল।

এখন আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি তা ঊষা উদিত হওয়ার পরের যুগ। একদিক থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর সে যুগও শেষ হয়ে গেছে। এ দিন যখন শুরু হয়েছে তখন এ থেকে কল্যান লাভের লক্ষ্যে এ যুগে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের জন্য যে বিজয় নির্ধারিত, তাকে জাগতিক আতিসয্য থেকে রক্ষা করতে এবং আধ্যাত্মিকতার মান উন্নত করতে আল্লাহ্ তাআলা প্রতি বছর আমাদেরকে পুনরায় রমযানে লায়লাতুল ক্বদরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ লায়লাতুল ক্বদরের যুগ ছিল এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অর্থাৎ একদিক থেকে তো তাঁর (সা.) আগমন এবং কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে গেছে এবং ঊষার উদয় হয়েছে। কিন্তু একদিক থেকে তা জারি থাকবে তাই এ লায়লাতুল ক্বদর পেতে হলে কুরআন এবং রমযানের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। এর মাঝে উম্মতের জন্য বার্তা হল, উম্মতও রমযানের একটি রাত যাকে লায়লাতুল ক্বদর বলা হয় তা থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বার বার আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং যদি এ অনুগ্রহ অনুধাবন করে আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে থাকি তবে নবী করীম (সা.)-এর জারিকৃত কল্যাণ থেকে লাভবান হতে থাকব।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সর্বদা তাঁর কল্যাণরাজী দান করতে থাকুন। আমাদের শত্রু যারা নিজ ধ্যানধারণা অনুযায়ী দিন-রাত আমাদের বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে অথবা আমাদেরকে অন্ধকারে দেখতে চাচ্ছে এবং আমাদের ধ্বংস কামনা করছে। নিজেদের ধারণা প্রসূত তারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু ঐশী জামা'ত কখনো বিনাশ হয় না ধ্বংস হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের ওপর যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বিশেষ করে পাকিস্তানে, আল্লাহ্ করুন এগুলো যেন লায়লাতুল ক্বদরের উপকরণ আনয়নের কারণ হয় এবং আমরা যেন ঊষার উদয়ের দৃশ্য দেখতে পাই যা সর্বদার জন্য প্রশান্তি এবং বিজয়ের অবস্থায় প্রকাশিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

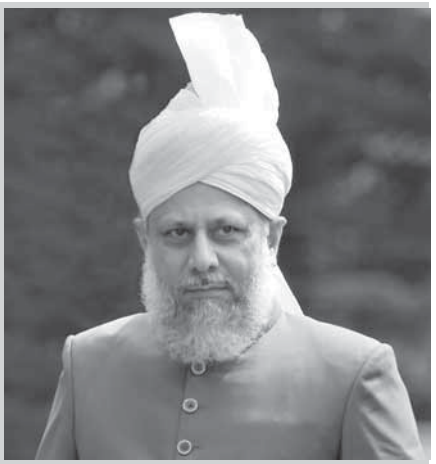

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

পবিত্র রমযান দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আল আনকাবুত: ৭০)

অনুবাদঃ আর যারা আমাদের দিকে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করব। নিশ্চই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। এখন আমরা রমযানের শেষ দশক অতিক্রম করছি। সব মুসলমান জানে এ মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। এ দশক সেই সোপান অর্জন করার বিশেষ দশক যাতে লায়লাতুল কুদর আসে। বিগত খুতবায় আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা করেছি। আজকের দিনও (জুমুআর দিন) খোদা তাআলার দৃষ্টিতে এক কল্যাণ মন্ডিত দিন যা তার সব কল্যাণসহ প্রতি সপ্তাহে আগমন করে। এতে দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বিশেষ মূহুর্তও আসে।

সুতরাং এ সব দিনে কল্যাণসমূহ জমা হচ্ছে, জমা হয়েছে এবং নিজ বান্দাদের প্রতি খোদা তাআলার অনুগ্রহরাজী বর্ষনের দিকে (আমাদের) দৃষ্টি আকর্ষন করছে। এ মনোযোগ সাময়িক হওয়া উচিৎ নয়, বরং আমার পঠিত আয়াতে যে বিষয় সম্পর্কে উলেখ রয়েছে অর্থাৎ খোদা অন্বেষনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা, সেদিকে একাগ্রতার সাথে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এ চেষ্টা প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে তা এক বান্দাকে খোদা তাআলার সান্নিধ্য প্রদান করে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। খোদা তাআলা নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন। এই চেষ্টা সাধনা কিভাবে সফল হবে তা এ আয়াত থেকে পরিস্কার হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সর্বদা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। যখন খোদা মিলনের প্রচেষ্টা হবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সব বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য থাকবে যেগুলো খোদা তাআলার নিকট পছন্দনীয় এবং যা তার নিকটবর্তী করে দেয়। যেভাবে আমি বলেছি, (আমাদের প্রতি) এটি খোদা তাআলার অনুগ্রহ যে তিনি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এখন রমযান মাস যা আমাদেরকে এ প্রচেষ্টা ও সাধনার সুযোগ প্রদান করছে। রমযানের রোযা এবং ইবাদত সমূহও এক বিশেষ মুজাহাদা (সাধনা)।

মানুষ যদি বুঝে শুনে এ সাধনা করে, এর মূল তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে তবে তা (মানুষকে) আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং এ আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমাদের বিশেষ ভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করব যে কি কি বিষয় ও পন্থা রয়েছে যেগুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেগুলো অবলম্বন করে এবং এসবের প্রতি মনোযোগী হয়ে আমরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর ঐ সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যাদের সৎকর্মশীলদের দল বানিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এক সুসংবাদ দিয়েছেন যে আমি সৎকর্মশীলদের সাথে আছি। অর্থাৎ ঐ সব লোকদের সাথে আছি যারা সৎ কাজ করে, সর্বদা পূণ্য কাজে নিয়োজিত এবং আমার পথের অন্বেষনকারী। যেভাবে আমি বলেছি, এ বর্ণনায় এখন আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি থেকে দেখব আমরা কিভাবে আল্লাহ্ তাআলার পথ লাভ করে সর্বদা ঐ দলে অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারি যাদের সাথে খোদা তাআলা সর্বদা থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে এবং এসব আয়াত সমূহের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এখন আমি এ বিশেষ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলব যে সম্পর্কে তিনি (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মানুষের সামর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাদের চিন্তা চেতনাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যতদূর সামর্থ ও যোগ্যতার সম্পর্ক, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা ও শক্তির মানের বিচারে তাতে ভিন্নতা রেখেছেন। কিন্তু আদেশ এই যে যতটুকুই যোগ্যতা ও সামর্থ রয়েছে, সে অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলাকে অন্বেষন কর এবং নিখুঁত ভাবে অনুসন্ধান কর। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন। কিন্তু মানবিক চিন্তা ভাবনা যদি এসব যোগ্যতা ও সামর্থের চূড়ান্ত ব্যবহারে বাধা হয়ে দাড়ায়, আত্মা যদি বিভিন্ন বাহানা খুঁজতে থাকে, সামান্য প্রচেষ্টাকে জুহ্দের

(সাধনা) নাম দেয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে লাভ করতে পারবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, এটা কিভাবে সম্ভব, যে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় অলসতা করছে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় খোদা তাআলার কল্যাণে ভূষিত হবে, যে সব জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) অনুসন্ধান করে। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলাকে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিই তাকে পেতে পারে। অথবা আমরা বলতে পারি আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে যা এক ক্রমাগত চেষ্টা সাধনার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি আকর্ষন করে মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করে।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা বর্নিত পন্থানুযায়ী চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ইমান বিল গায়ব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) এবং তাঁর শক্তি ও গুনাবলী সমূহের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, ক্রমাগত এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি আল্লাহ্ তাআলাকে চেনার প্রচেষ্টা করা হয় তবে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন না। আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য, তার পথের সন্ধানের জন্য বান্দাকেই প্রথমে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে এ বিষয়ে অন্ধকারে রাখেন নি যে কিভাবে পথের সন্ধান করতে হবে? সর্ব প্রথম এ যুগের জন্য, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে কেয়ামত কাল পর্যন্ত আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কুরআন মজীদ রেখেছেন যে এর মধ্যে পথের সন্ধান কর। এর পূর্বেও নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং নবীদের মাধ্যমে নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রমানও উপস্থাপন করেছেন। যেন এসব দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে আসার রাস্তা চেনা যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যে আমাদের পথে চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে, তাকে আমরা আমাদের পথ প্রদর্শন করব। এটিতো প্রতিশ্রুতি, আর এদিকে এ দোয়া রয়েছে যে, **"ইহদিনাস্ সিরাত্বাল মুস্তাক্বিম"**।

সুতরাং মানুষের এটিকে দৃষ্টিতে রেখে নামাযে বিনয়ের সাথে এ দোয়া করা প্রয়োজন এবং সাথে এ আশাও রাখতে হবে যে সেও যেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যারা উন্নতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে। তাকে যেন এ দুনিয়া থেকে জ্ঞানহীন ও অন্ধ অবস্থায় উঠিয়ে নেয়া না হয়। সুতরাং সূরা ফাতেহার এ দোয়া যা প্রত্যেক নামাযে সব রাকাতে আমরা পাঠ করি, এর উপর চিন্তা করুন এবং ব্যথাতুর চিত্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ নির্দেশ চান। এরুপ দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেন এবং নিজের দিকে আসার পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ ও প্রত্যাদিষ্টগণ নিদর্শনাবলীসহ আসেন যাতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন যে আল্লাহ্ তাআলার পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা কর যাতে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করতে পার। এটি স্পষ্ট যে যখন কোন বুদ্ধিমান লোক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রেক্ষিতে কোন কাজ করে এবং এদ্বারা উপকৃত হয়, তখন স্বভাবতই সে সেই মনোযোগ আকৃষ্টকারীর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয়ে তার সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং করা উচিৎ। এটাই বিবেকের দাবী যে বেশী বেশী লাভবান হও। সুতরাং এ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যে অনুধাবন করে সে সফল হয়। পূর্বে বলে এসেছি, নবীগণ এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিতগণও আল্লাহ্ তাআলার পথ সমূহ প্রদর্শন করে থাকেন।

সুতরাং একজন বুদ্ধিমান মানুষের তার সাথে সম্বর্ক স্থাপন করে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ যুগে মসীহ ও মাহদী আসার সংবাদও দিয়েছেন, তাই খোদা তাআলার সাথে দাসত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি নির্ধারিত ছিলেন, তাঁর (আ.) প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য মুসলমানদের সামনে দোয়াও বিদ্যমান রয়েছে এবং অধিকাংশ সময় তা পাঠও করা হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন! না জেনে না বুঝে অস্বীকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে তাঁর পথ সমূহ পাওয়ার চেষ্টা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, আমি অমুসলিমদেরও কয়েকবার বলেছি, আমাদের দোয়া শিখানো হয়েছে, **"ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"**। তোমরা এ দোয়া পাঠ কর, কিন্তু তোমরা যদি এ দোয়াও পাঠ না করতে পার তবে নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় এ দোয়া কর যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সোজা পথ দেখান। তাহলেও আল্লাহ্ তাআলা পথ দেখাবেন এবং তিনি বলেছেন, অনেকে আমাকে বলেছেন, এদ্বারা তাদের কাছে ইসলামের সত্যতা পরিস্কার হয়ে গেছে। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে কিছু অমুসলিম ভীত হয়ে অথবা নিজ জাগতিক স্বার্থের জন্য ইসলাম গ্রহন করেনি। কিন্তু সত্য সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে যায়। বিশেষ ভাবে মুসলমানদের এ ব্যবস্থাপত্র পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ যাতে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে শুধু তার সন্তুষ্টি অর্জনই নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিয়ে যায় এমন নতুন নতুন পথও পেয়ে যায়। এ বিষয়টি আমাদের জন্যও আবশ্যক। আমরা যারা আহমদী, এ যুগের ইমামকে মেনেছি, আমাদের শুধু বয়আত করে অলসভাবে বসে যাওয়া উচিৎ নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্ধান এবং তার সান্নিধ্য লাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা প্রয়োজন, বিশেষ ভাবে এ ক'দিন (রমযানের শেষ দশক) বিশেষ মনোযোগী হোন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলা সে সম্বন্ধে পূর্ন অবগত আছেন এবং তোমরা যদি সৎকর্ম পরায়ন হও তবে (স্বরন রাখ) তার দিকে যারা ঝুকে তিনি তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল। সুতরাং আমরা যদি একনিষ্ঠ ভাবে তার ক্ষমা পাওয়ার জন্য তার প্রতি ঝুকি তবে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার দিকে আসার আরো উজ্জল পথ দেখাবেন, মর্যাদা আরো উন্নীত হবে। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে তার দিকে আসার প্রচেষ্টাকারীদের পথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমনি ভাবে যারা আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরে সরে যায় তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আচরন এমন হয় যে তারা অন্ধকারে নিপতিত হতে থাকে। যেমন কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ফালাম্মা যাগু আযাগাল্লাহু কুলুবাহুম ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল ক্বাওমাল ফাসিকিন"**। সুতরাং তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল আল্লাহ্ তাআলা তখন তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা দুস্কৃতিপরায়নদের হেদায়াত দেন না।

এর ব্যাখ্যা প্রদান করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, যেভাবে আমাদের পার্থিব জীবনে পরিস্কার দেখা যায় প্রত্যেক কাজের অবশ্যই একটি ফল আছে এবং সে ফল হচ্ছে খোদা তাআলার কাজ। তেমনি ধর্মীয় বিষয়েও এ নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ্ তাআলা এ দুটি দৃষ্টান্তে পরিস্কার বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** এবং **"ফালাম্মা যাগু আযাগাল্লাহু কুলুবাহুম"** অর্থাৎ যারা খোদা তাআলার সন্ধানে পূর্ন প্রচেষ্টা করে, তার এ কাজের ফল স্বরুপ তাদের আমরা আমাদের পথ দেখাব। এবং যারা বক্রতা অবলম্বন করে এবং সোজা পথে চলতে চায় না, তাদের প্রতি আমাদের এ আচরন হবে যে আমরা তাদের হৃদয় সমূহ বক্র করে দেব।

সুতরাং এটা বান্দাদের দুর্ভাগ্য যে তারা নিজেদেরকে খোদা তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ক'দিন আগে পাকিস্তান থেকে আগত এক অআহমদী বলেন, দেশে যেসব হচ্ছে এর কারন কি? কবে ঠিক হবে? কিভাবে হবে? তখন আমি তাকে বললাম, দুটি বিষয় আমাদের সামনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমার দিকে আস, চেষ্টাকর, সাধনা কর। এর উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমার সন্তুষ্টি অর্জনের সব পথ সন্ধানের প্রাণপন চেষ্টা কর, তবে আমি পথ দেখাব। আপনিই বলুন, এ দৃশ্য কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তখন তিনি বলেন, বরং হিসাব উল্টো । তখন আমি বললাম, যেহেতু হিসাব উল্টো তাই আল্লাহ্ তাআলার অন্য অচরন প্রকাশ হচ্ছে। সুতরাং জাতিগত ভাবে আমাদেরকে আমাদের চিন্তা ধারা ও গতি পথ ঠিক করতে হবে। আমরা যদি সৎ নিয়্যতে দেশের উন্নতি চাই তবে পাকিস্তানী জাতিকেও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে হবে। বর্তমানে পাকিস্তানের সব গন মাধ্যম হৈ চৈ করছে। পাকিস্তানেও এবং এর বাইরেও লোকেরা অনেক কথা বলছে যা এখানে আমার উলেখ করার প্রয়োজন নেই। তারা তো কিছু কথা বার্তা বলে, কিছু মন্তব্য করে বিষয়টির ইতি টেনেছে। কিন্তু অন্যায় ও বর্বরতার যে চিত্র সর্বত্র দেখা যাচ্ছে শুভ দৃষ্টি নিয়ে সেগুলো প্রতিরোধের কার্যকর প্রচেষ্টা কেউ করছে না। আল্লাহ্ তাআলা দয়া করুন।

সৎ প্রকৃতির লোকদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কেমন ব্যবহার করেন-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের অন্তরে কয়েক ধরনের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা করুনা স্বরূপ পূণ্যাত্মা লোকদের দুর্বলতা সমূহ দূর করে দেন এবং তাদের পবিত্র করেন ও পূণ্য করার শক্তি দান করেন। অর্থাৎ পরিশেষে নিজের পক্ষ থেকে তা দান করেন। অত:পর যখন আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যাক্তিকে পবিত্রতা ও পূণ্য দান করেন তখন তারও দৃষ্টিতে সে সব বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে যায় যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। তার তুচ্ছ প্রচেষ্টার কারনে আল্লাহ্ তাআলা তার এ নগন্য প্রচেষ্টায় প্রবৃদ্ধি দান করেন এবং (কল্যাণের) দরজা উন্মুক্ত করে দেন। তখন ঐ সব পথ তার কাছে প্রিয় হয়ে যায় যেগুলো খোদা তাআলার কাছে প্রিয়। সে এমন এক শক্তি লাভ করে যার পর দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই এবং এমন এক উদ্দিপনা প্রাপ্ত হয় যার পর কোন অলসতা নেই। এমন তাকওয়া প্রাপ্ত হয় যার পর কোন সীমা লঙ্ঘন নেই। দয়াময় প্রভু তার প্রতি এমন সন্তুষ্ট হয়ে যান যে এর পর আর কোন গুনাহ নেই। কিন্তু এ পুরস্কার অনেক দেরীতে লাভ হয়। প্রথম প্রথম দুর্বলতা বশে মানুষ বার বার ধাক্কা খায় এবং পদস্খলিত হয়। কিন্তু তার সৎ প্রকৃতি দেখে (আল্লাহ্ তাআলার) উচ্চ শক্তি তাকে আবার টেনে তোলে। অর্থাৎ এটি একটি স্থায়ী প্রচেষ্টা, মানুষ পদস্খলিত হয়, অত:পর আবার আল্লাহ্ তাআলার দুয়ারে আসে। এরপর আবার দূরে সরে যায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এরপর আবার সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ধাবিত হয়। এটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যা চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা যখন দেখেন যে সে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন আল্লাহ্ তাআলার শক্তি অর্থাৎ সর্বোচ্চ শক্তি তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়। তিনি (আ.) সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যা আল্লাহ্ জালা শানুহু বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"**। সুতরাং এটি ধারাবাহিক এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টা যার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। আরবীতে বলেছেন, **"নুসাব্বিতুহুম আলাত্তাকওয়া ওয়াল ইমান ওয়া নাহদিয়ান্নাহুম সুবুলাল মুহিব্বাতে ওয়াল ইরফানে ওয়া সানুইয়াস্‌সেরুহুম লেফে'লিল খায়রাতে ওয়া তারকিল ইসইয়ানে"**। সুতরাং এটি স্থায়ী ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা যাতে তাকওয়া ও ইমানে স্থায়ীত্ব অর্জিত হয়।

অত:পর মানুষ এর উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ সে লাভ করে। পূণ্য কাজ করার এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন এবং এটা আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার যে তিনি সাহায্য করবেন। এক স্থানে তিনি (আ.) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, চেষ্টা সাধনাতেই সব পূণ্য রয়েছে। খোদা তাআলা বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের দিকে আসার চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের সব পথ উন্মুক্ত করে দেই। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। যারা বলে সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ:) এক পলকে চোরকে কুতুব বানিয়ে দিয়েছিলেন, তারা ভ্রান্তিতে আছেন। এমন সব বিষয়ই মানুষকে ধ্বংশ করেছে। লোকেরা ধারনা করে কারো ঝার ফুঁকের মাধ্যমে কেউ বুযুর্গ হয়ে যেতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রচলন হয়ে গেছে - তারা কবরে যায়, পীরদের কাছে যায়, তাবিজ-কবয নেয়, তাদের মনোবাসনা পূরনের জন্য দোয়া করায় অথবা তারা মনে করে তারা নামায পড়ুক বা না পড়ুক, এতে তাদের সব গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

তিনি (আ.) বলেন, যে খোদা তাআলার সাথে তাড়াহুরো করে সে ধ্বংশ হয়। দুনিয়াতে যেমন সব বিষয়েই ধাপে ধাপে উন্নতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিও এভাবেই (ধাপে ধাপে) হয়। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আর সেই চেষ্টা সাধনাও হতে হবে খোদা তাআলা নির্ধারিত পন্থায়, এই নয় যে কুরআন করীমের নির্দেশনার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেই নিরর্থক ঋষিদের ন্যায় সাধনা ও ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যাও। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই খোদা তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি পৃথিবীবাসীকে দেখিয়ে দেই, মানুষ কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌছতে পারে। এটাই ঐশী বিধান, সবাই বঞ্চিত থাকে না আবার সবাই হেদায়াতও পায় না। লোকেরা যিকরের কিছু মাহফিল বা মজলিশ বানিয়েছে। কিছু কিছু স্থানে কখনো কখনো এ অভিযোগ পাওয়া যায় যে আহমদীরা এ বিষয়টিকে বেশ প্রাধান্য দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সুন্নত থেকে দূরে সরে যে কাজ করা হবে তা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করতে পারে না। অথবা শুধু আলাহু-আলাহু বলে বা এ ধরনের অন্য কোন যিকির করে, কিংবা কখনো কখনো যিকির আযকারের যে দীর্ঘ মজলিশ বসানো হয়-এসব করে যদি মনে করা হয় আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে এবং নামায ও অন্যান্য বিষয় থেকে ছুটি পেয়ে গেছে, এটি কখনো হতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, যে লোক মনে করে, আমাকে যেন কোন কষ্ট ও পরিশ্রম করতে না হয়, সে ভ্রান্তিতে আছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে পরিস্কার বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"**। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খোলার জন্য চেষ্টা সাধনা প্রয়োজন। আর সেই চেষ্টা সাধনা সে পন্থায় হতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৃষ্টান্ত ও সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে। বহু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তম নমুনা ত্যাগ করে পীর মুর্শিদ ও ফকিরদের কাছে যায়, যেন তারা ফুঁ মেরে কিছু করে দেবে। এগুলো বৃথা জিনিষ। এমন লোক যারা শরিয়ত মেনে চলে না এবং এমন বৃথা দাবী করে, তারা ভয়ানক পাপ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা এবং তার রসূলের চাইতেও নিজেদের মর্যাদা বাড়াতে চায়। কেননা হেদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাজ। সে এক মুষ্ঠি মাটি হয়ে নিজেই হেদায়াত দেয়ার দাবী করে। এসব পীর ফকিররাও আল্লাহ্ তাআলা ছাড়াই নিজেদের হেদায়াত দাতা মনে করে। কোন

তাবিজ দিয়ে দিল বা চুড়ি পরিয়ে দিল, আর বলে দিল ব্যস, তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এবং ওমুক ওমুক জিনিষ তোমাদের হবে এবং তোমরা পূণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেছেন, এটি খোদা তাআলার সত্যিকার প্রতিশ্রুতি, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ও সৎ নিয়তে তার পথের সন্ধান করে, তিনি তার কাছে হেদায়াত ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ সমূহ উন্মুক্ত করে দেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের পথ সমূহ উন্মুক্ত করে দেই। "আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে" এ কথার অর্থ নিষ্ঠার সাথে এবং সৎ নিয়্যতে 'খোদার সন্তুষ্টি অর্জন' লক্ষ্য নির্ধারন করে। কিন্তু যদি কেউ খেল তামাশা ও ঠাট্টা বিদ্রুপের পথ অবলম্বন করে, সে-ই হতভাগ্য বঞ্চিত রয়ে যায়। সুতরাং এ পবিত্র নীতির উপর থেকে যদি তোমরা খাঁটি অন্তরে চেষ্টা কর এবং দোয়া করতে থাক, তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্ তাআলার পরোয়া না করে, তবে তিনিও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন। প্রত্যেক উদ্ধৃতিতেই কিছু না কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে। এজন্য আমি এটি নিয়েছি। পূর্বেও উলেখ করা হয়েছে, কাউকে হেদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাজ। আর হেদায়াত সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার দাবী করে, যদি তার সত্যতার ব্যাপারে কারো সন্দেহ সংশয় থাকে এবং কোন ধরনের নিদর্শন দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে তার সত্যতা জানার জন্যও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রয়োজন। কিন্তু যদি তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তু বানানো হয়, তবে মানুষ হেদায়াত লাভে বঞ্চিত থেকে যায়। শুধু বঞ্চিতই থাকে না, বরং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ধৃত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, খোদা তাআলা তো সব মানুষকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের রঙে রঙ্গিন করতে চান। কেননা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার নিজ প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,**"সিবগাতাল্লাহে ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহে সিবগাতান ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন"**। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রং ধারন কর এবং রংয়ের দিক থেকে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম আর কে হতে পারে? আর আমরা তার ইবাদত কারী। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আল্লাহ্ তাআলার রঙে রঙ্গীন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যাতে করে সে খোদা তাআলার সান্নিধ্য অর্জনের পথ পাড়ি দিতে পারে এবং নৈকট্য অর্জনের পথ দেখতে পায়। **"সিবগাতাল্লাহে"** এর অর্থ হচ্ছে ঐশী গুণাবলীর রং নিজের ভেতর সৃষ্টির চেষ্টা করা ।

আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু স্বয়ং এ কথা বলেছেন, তাই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা মানব প্রকৃতিতে এ যোগ্যতা ও সামর্থ রেখেছেন যে সে ঐশী গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা আদমকে নিজ চেহারায় সৃষ্টি করেছেন"। এখানে চেহারা অর্থ আদম নিজের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ধারণ করেছে এবং আদম অর্থ আদম সন্তান। অর্থাৎ সব মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা সাত্তার (অতি গোপন), তাই মানুষকেও আল্লাহ্ তাআলার এ গুন থেকে অংশ নিয়ে সাত্তারী ও গোপনীয়তার গুণ অবলম্বন করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা শাকুর (প্রশংসা ভাজন), মানুষেরও প্রশংসা ভাজন হওয়া প্রয়োজন। যখন আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে শাকুর শব্দ আসে, তখন যদিও তার অর্থ ভিন্ন, কেননা আল্লাহ্ তাআলা সব ক্ষমতার অধিকারী। বান্দা কৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে এর বিনিময়ে মর্যাদা দেন। আল্লাহ্ তাআলার একটি অনেক বড় গুন তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক। এটিকে সামনে রেখে প্রত্যেক মু'মিনও নিজ নিজ কর্তৃত্ব ও গন্ডীতে রব (প্রতিপালক)। পিতা মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করেন। এক সীমিত পর্যায়ে তাদেরও প্রভুত্বের একটি গন্ডী রয়েছে। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য গুণাবলীও রয়েছে।

সুতরাং এসব সুন্দর গুণাবলীকে সামনে রেখে যখন মানুষ প্রচেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। আর যখন সে চেষ্টা করে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে যেভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তার প্রচেষ্টায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, খোদার সাথে মিলে খোদার সন্ধান কর। নিষ্ঠার সাথে খোদা সন্ধানের চেষ্টা করলে খোদা পেয়ে যাবে। খোদার সাথে মিলে খোদার সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে তার গুনাবলী নিজের মধ্যে ধারণ কর। আল্লাহ্ তাআলা রহমান ও রহীম এবং তার রহমত প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তার নামে অত্যাচার ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ড সংঘটিত কারীরা কিভাবে আল্লাহ্ তাআলার পথ পেতে পারে। আজও ভীতিপ্রদ একটি সংবাদ এসেছে। মর্দানের মসজিদে জুমা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা হামলা করে। কিন্তু দায়িত্বরত খোদ্দামের তৃড়িৎ পদক্ষেপে সে বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। সে কিছুই করতে পারে নি। ভেতরেই ঢুকতে পারেনি। সে গ্রেনেড প্রভৃতি নিক্ষেপ করে এবং নিজেই আত্মঘাতী হামলার শিকার হয়ে আহত হয়। আহত হবার পর সে বিস্ফোরন ঘটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এ কারনে মসজিদের গেট ও দেয়াল প্রভৃতি ধ্বসে পড়ে। সেখানে দায়িত্বরত এক জন খাদেম শহীদ হয় এবং কয়েকজন খাদেম আহতও হয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

আল্লাহ্ তাআলা এ শহীদকে মর্যাদায় উন্নীত করুন এবং বাকীদেরকেও আরোগ্য দান করুন। অন্যান্য হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। যাই হোক, এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরা কেমন লোক যে ইসলামের নামে, খোদার নামে এসব কাজ করছে। যারা বলে কিনা আমরা খোদার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে ধারনকারী। এসব লোক যারা আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের উপর হামলা করে, এদেরতো কোন ভাবেই খোদার পক্ষাবলম্বনকারী বলা যায় না। দুদিন পূর্বে আমরা দেখেছি, শিয়াদের একটি শোভাযাত্রায় হামলা হয়েছে। সেখানে বিনা কারনে নিস্পাপ কিছু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। বহু লোক আহতও হয়েছে। এসব লোকদের অন্তর আল্লাহ্ তাআলা এতটাই বক্র করে দিয়েছেন যে বাহ্যত মনে হচ্ছে এথেকে এদের ফেরার কোন পথ নেই। আর যারা এদের সাহায্য করছে ও প্রশ্রয় দিচ্ছে বা যাদের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এদের দমনের জন্য পুরোপুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তারাও এর জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা শীঘ্র এসব অত্যাচারীদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করুন। বরং পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করুন। কারন এখনতো সমগ্র দুনিয়াতে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টার অবস্থা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এ উদাহরন দিয়েছেন, যারা চেষ্টা সাধনা করে তারা অবশেষে পথ লাভ করে।

যেমন চেষ্টা প্রচেষ্টা ও পানি সেচ ছাড়া রোপিত বীজ সমূহ বৃদ্ধি পায় না, বরং (বীজ) নিজেও বিনাশ হয়ে যায়। অনুরুপ ভাবে তোমরাও যদি এ অঙ্গীকার প্রতি দিন স্মরন না কর এবং এ দোয়া না কর, হে খোদা! আমাদের সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য লাভ হবে

না। আর আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ছাড়া পরিবর্তন অসম্ভব। সুতরাং যেভাবে বীজ চারায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় নিজেকে বিনাশ করে চারায় রূপান্তরিত হয়, তেমনি তোমরাও যদি ফলবান বৃক্ষ হতে চাও তবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর যদি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে নিজেকে বিলীন কর। এতেই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যেও এ অনুপ্রেরনা জারী থাকবে যারা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সুতরাং এটি কোন সাময়িক প্রচেষ্টা নয়, বরং স্থায়ী প্রচেষ্টা যা এক বিশ্বাসীর জন্য ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। ঐ বীজের ন্যায় নিজেকে নাশ করা প্রয়োজন যা ফলবান বৃক্ষে পরিনত হয়। এবং তা তখন হবে যখন তোমরা এ যুগের ইমামের সাথে এবং খোদা তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখবে। "আমরা তাদের সাহায্য করি, তাদের পথ দেখাই, যারা ক্রমাগত প্রচেষ্টা করে"- আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতিকে যদি সর্বদা দৃষ্টিতে রাখ, তবেই সফল হতে পারবে। আর যদি এটিকে স্মরণ না রাখ, তবে সফল হতে পারবে না।

এক স্থানে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন, কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি, এক দিকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে নিজ করুনা, দয়া, কৃপা ও অনুগ্রহের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তার রহমান হওয়া প্রমাণ করেন। আর অপর দিকে বলেছেন," ইন্না লাইসা লিল ইনসানে ইলা মা সাআ" এবং **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ খাঁটি অন্তরে চেষ্টা সাধনার মাধ্যমেই তাঁর কল্যাণ লাভ সম্ভব। এ ব্যাপারে সাহাবাদের (রা.) কর্ম কান্ড সমূহ আমাদের জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত এবং উত্তম নমুনা। সাহাবাদের (রা.) জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখ, তারা কি শুধু সাধারন নামাযের মাধ্যমেই সেই উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন? না, বরং তারা তো আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের প্রানেরও মায়া করেন নি। ছাগল ভেড়ার ন্যায় খোদা তাআলার পথে কুরবান হয়েছেন। এ পর্যায়ে গিয়ে তারা এ উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন।

অধিকাংশ লোককে দেখেছি তারা চায়, যেন এক ফুঁ-এর মাধ্যমে তাদের এই মর্যাদা দান করা হয় এবং তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাইতে বড় আর কে হতে পারে! তিনি সর্বোত্তম মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও নবী ছিলেন। তিনিই যখন ফুঁ মেরে এ কাজ করেন নি, তবে আর কে এ কাজ করতে পারে। দেখো, তিনি হেরা গুহায় কিরূপ ধ্যান করেছিলেন। খোদা জানেন কত দীর্ঘ সময় ব্যাপী অনুনয় বিনয় ও কান্না কাটি করেছেন। পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেমন চরম চেষ্টা সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তখন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে। আসল কথা এটাই, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে নিজের উপর এক মৃত্যু এবং বিলীন অবস্থা আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেদিক থেকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যখন দেখেন কোন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা করছে এবং তাঁকে পাবার জন্য নিজের উপর মৃত্যু আনয়ন করেছে, তখন তিনি মানুষের উপর স্বয়ং প্রকাশিত হন এবং তাকে কল্যাণ দান করেন। ঐশী সাহায্য দ্বারা তার পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) বলেছেন, খোদা তাআলার দিকে চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী কখনো ব্যর্থ হয় না। তাঁর (খোদা তাআলার) এটা সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** খোদা তাআলার পথের সন্ধানে যে নিয়োজিত সে পরিশেষে অভিষ্ঠ গন্তব্যে পৌঁছবে। জাগতিক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণকারী, রাতকে দিন বানানোকারী ছাত্রদের পরিশ্রম ও করুন অবস্থা দেখে যেখানে আমাদের দয়া হয়, তবে অসীম ও অন্তহীন দয়াময় ও করুনাময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের দিকে আগত ব্যক্তিকে কিভাবে বিনষ্ট করতে পারেন? কক্ষনো না, কক্ষনো নয়। আল্লাহ্ তাআলা কারো প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেন না। অত:পর ঈমানী দৃঢ়তা অর্জন এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সূক্ষ্ম যে পার্থক্য রয়েছে, এর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, বিশ্বাসীগণ পবিত্রাত্মার যে সাহায্য লাভ করে, তা শুধু মাত্র খোদা তাআলার পুরস্কার স্বরূপ হয়ে থাকে। কেবল সে-ই এটি পায় যে সত্যিকার হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনে। তা কোন চেষ্টা প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ হয় না, শুধু মাত্র ঈমানের মাধ্যমেই লাভ হয় এবং বিনামূল্যে লাভ হয়। শর্ত কেবল এই, এমন ব্যক্তিকে খাঁটি ঈমানদার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল হতে হবে। কিন্তু খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত যার উলেখ **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** আয়াতে রয়েছে, তা শুধু চেষ্টা সাধনা দ্বারা লাভ করা সম্ভব।

প্রথমত এটি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ হচ্ছে এবং এর জন্য বিশেষ চেষ্টা সাধনা করে তা অর্জন করতে হবে। চেষ্টা সাধনা কারী ব্যক্তির উদাহরণ অন্ধের ন্যায়। অধিক চেষ্টা সাধনা ছাড়াই সাধারন ঈমানী অবস্থাতো সে লাভ করে, কিন্তু তখনো তার অবস্থা অন্ধের ন্যায় হয়ে থাকে। তার আরো উন্নত মর্যাদা লাভ করার প্রয়োজন বাকী থাকে। তার দৃষ্টি লাভ করতে আরো দূরত্ব বাকী থাকে। কিন্তু পবিত্রাত্মার সাহায্য তাকে পূণ্যবান বানিয়ে দেয় এবং তাকে শক্তি দান করে এবং সে চেষ্টা সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে পৌঁছানর চেষ্টা সাধনা করতে থাকে, তখন সে পবিত্রাত্মা থেকে শক্তি লাভ করে এবং সে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যায়। আর চেষ্টা সাধনার পর মানুষ আরেক আত্মা লাভ করে যা পূর্বের আত্মা থেকে অনেক শক্তিশালী এবং প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু এই না যে এরা দুটি আত্মা, পবিত্রাত্মা একটাই। পার্থক্য কেবল শক্তির মানের। একই রুহ, একটিতে বেশী শক্তি, আরেকটিতে কম। প্রথম পর্যায়ে শক্তি কম ছিল, যখন দ্বিতীয় পর্যায় লাভ করে তখন অধিক শক্তি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও পরিচয় অধিক লাভ হয়। তার দিকে অগ্রসর হওয়ার নতুন নতুন পথের দিক নির্দেশনা লাভ হয়। যেমন খোদা দুজন নয়, বরং একজনই। কিন্তু সেই খোদাই বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ এসব লোকদের সাহায্যকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকেন এবং তাদের জন্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন, তিনি অন্যদের এরূপ অলৌকিক নিদর্শন দেখান না।

এরপর তিনি বলেন, যে ব্যাক্তি খোদা তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ্ তাআলাও তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। হ্যাঁ, এটা আবশ্যক যে যতদূর সম্ভব সে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টায় কোনরূপে ত্রুটি করবে না। অত:পর তার প্রচেষ্টা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন সে খোদা তাআলার নূর দেখতে পাবে। **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** -এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত আছে, সে যেন তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, এমন যেন না হয় যেখানে বিশ হাত খনন করে পানি পাওয়া যাবে সেখানে সে দু হাত খনন করে হাল ছেড়ে দেয়। প্রত্যেক কাজের সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে হাল ছাড়া যাবে না। এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে যদি কেউ পূর্ণরূপে দোয়া ও পবিত্র অন্তর নিয়ে কাজ করে, তবে কুরআন মজীদের সব প্রতিশ্রুতি তার উপর পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, যে বিরোধী কাজ করবে সে বঞ্চিত থাকবে।

কেননা তার সত্ত্বা অতি লজ্জাশীল। তিনি তার নিজের দিকে আসার পথ অবশ্যই রেখেছেন, কিন্তু তার দরজা খুব সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ। সেখানে শুধু সে-ই পৌঁছতে পারে যে তিক্ত শরবত পান করে। লোকেরা পার্থিব চিন্তায় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। এমনকি অনেকে এতে ধ্বংশ হয়ে যায়।

কিন্তু তারা আল্লাহ্ তাআলার জন্য একটি কাঁটার আঘাত সহ্য করাও পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি সততা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও করুনা কিভাবে প্রকাশ পাবে? সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যে একজন বিশ্বাসীর কাজ হলো ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি (আ.) বলেছন, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এটাই, ইসলাম সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান দান করে, যাতে মানুষের পাপ পঙ্কিল জীবনে মৃত্যু নেমে আসে, অত:পর তাকে এক নব জীবন দান করা হয় যা বেহেশতী জীবন হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটি নিশ্চিত বিষয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষ কেন এটি দেখতে পায় না? এর উত্তর হচ্ছে, এটি আল্লাহ্ তাআলার বিধান যে চেষ্টা সাধনা, তওবা এবং পূর্ণ অভিনিবেশ ব্যতীত এটি লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করবে, তারাই এই পথ লাভ করবে।

সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধি-বিধান মান্য করবে না, বরং তা উপেক্ষা করবে, তাদের জন্য এ দরজা কিভাবে খুলবে? এটা হতে পারে না। অত:পর বলেন, এরা পবিত্রাত্মার শক্তিতে ভরপুর হয়ে এ চেষ্টা সাধনায় লেগে থাকে, অর্থাৎ সাহাবাদের ন্যায় সৎকাজের মাধ্যমে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়। তখন তারা খোদা তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত হয়, মানুষের পক্ষে যার চাইতে অধিক কল্পনা করাও অসম্ভব। তারা খোদার পথে নিজেদের প্রান খড়কুটার ন্যায় বিলিয়ে দিয়েছেন, (প্রাণ সমূহকে) খড়কুটার সমান মূল্যও দেন নি। অবশেষে তারা (খোদার কাছে) গৃহীত হয়েছেন এবং খোদা তাআলা তাদের অন্তর সমূহকে গুনাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ বানিয়েছেন এবং পূণ্যের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করি। এ চেষ্টা সাধনার ফলেই সাহাবাগণ সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যার সম্বন্ধে হাদীসে এসেছে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনেছি, হুযুর (সা.) বলেছেন, আমি আমার সাহাবাগনের ইখতেলাফ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি।

তখন আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি ওহী করেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আমার নিকট তোমার সাহাবাদের এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন আকাশে নক্ষত্র সমূহ রয়েছে। এদের একটি অন্যটির চাইতে উজ্জল। কিন্তু নূর সবার মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং যে কেউ তোমার কোন সাহাবীর অনুসরন করবে, সে আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। হযরত উমর (রা.) এটাও বলেছেন, হুযূর (সা.) বলেছেন, আমার সাহাবাগন তারকা সদৃশ। তাদের মধ্যে যে কারো অনুসরন করলে তোমরা হেদায়াত পাবে। সুতরাং সাহাবাগণ (রা.) তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সাধনায় এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা এ পুরস্কার দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেছেন, এ বয়আত গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদা তাআলার প্রতি ভালবাসায় যেন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং গুনাহের প্রতি ঘৃনা জন্মিয়ে সেখানে যেন পূণ্য সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রাখে না এবং বয়আত গ্রহণের পর নিজের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন আনার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম করে না এবং সাধ্যানুযায়ী দোয়া করে না, তবে সে খোদা তাআলার সাথে কৃত এ অঙ্গিকারের তীব্র অসম্মান করে এবং সে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয়। সুতরাং কখনো এটা ভাবা উচিৎ নয় যে বয়আতের এ অঙ্গীকারই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং আমাদের আর কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই।

এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ, যে ব্যাক্তি দরজায় কড়া নাড়ে, তার জন্য দরজা খোলা হয়। কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের দিকে আসে, আমাদের জন্য চেষ্টা সাধনা করে, আমরা তাদের জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত করে দিই এবং তাকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত করি। কিন্তু যে ব্যাক্তি চেষ্টাই করে না, সে কিভাবে এ পথ পেতে পারে। খোদা প্রাপ্তি, সত্যিকার সফলতা এবং মুক্তির রহস্য ও মূল চাবিকাঠি এটাই। মানুষের জন্য আবশ্যক যে সে খোদা তাআলার পথে চেষ্টা সাধনায় কখনো ক্লান্ত হবে না, অসহায় হবে না এবং তার পথে কোনরূপ দুর্বলতা দেখাবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তত্ত্বপূর্ণ এই কথা বুঝার ক্ষমতা দিন। সর্বদা আমাদের প্রচেষ্টা জারী রাখার এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ধাবিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের অঙ্গীকার পালনে দুর্বলতা দেখিয়ে এবং আমাদের প্রচেষ্টায় ঘাটতি করে আমাদের যেন খোদা তাআলার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজ অঙ্গীকার পালন করার এবং খোদা তাআলার সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য দান করতে থাকুন। আর বিশেষ ভাবে (রমযানের) বাকী দিন গুলো আমরা যেন পূর্বের চাইতে বেশী বেশী দোয়ায় অতিক্রম করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যেন আমাদের ঢাল হয়ে যান এবং আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করার উপকরন সৃষ্টি করুন।

যে শহীদের কথা আমি উলেখ করেছিলাম, প্রথমে আমার ধারনা ছিল হয়তো তার সংবাদাদী আসেনি, যানাযা পরবর্তী জুমুআয় হবে। কিন্তু যেহেতু সংবাদাদী এসে গেছে তাই জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমরা তার গায়বে যানাযা নামায পড়ব। শহীদের নাম শেখ আমের রেযা সাহেব, পিতা-মোকাররম মুশতাক আহমদ সাহেব। তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে সেবা করছিলেন। এছাড়াও শহীদ কায়েদ মজলিশ এবং জেলা কায়েদ হিসেবেও সেবা দানের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তার নিজস্ব ইলেকট্রোনিক্সের ব্যবসা ছিল। তিনি ভেতরে ছিলেন। সেখানে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তা এত তীব্র ছিল যে দেয়াল ভেতর দিকে ভেঙ্গে পড়ে এবং দরজাও ভেতর দিকে ভেঙ্গে পড়ে। এজন্য তিনি ভীষন আহত হন।

হাসপাতালে নেয়ার পথে রাস্তায় শহীদ হন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী আহমদী ছিলেন। তার পরিবার বর্গের মধ্যে তার স্ত্রী লুবনা আমের সাহেবা এবং এক ছেলে উসামা আমের, বয়স নয় বছর এবং দেড় বছরের একটি শিশু সন্তান আছে। দাফনের জন্য ইনশাআল্লাহ্ তার জানাযা রাবওয়াহ্ নিয়ে যাওয়া হবে। জুমুআর নামাযের পর আমরা তার জানাযা গায়েব আদায় করব।

অনুবাদ : **মওলানা শরীফ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

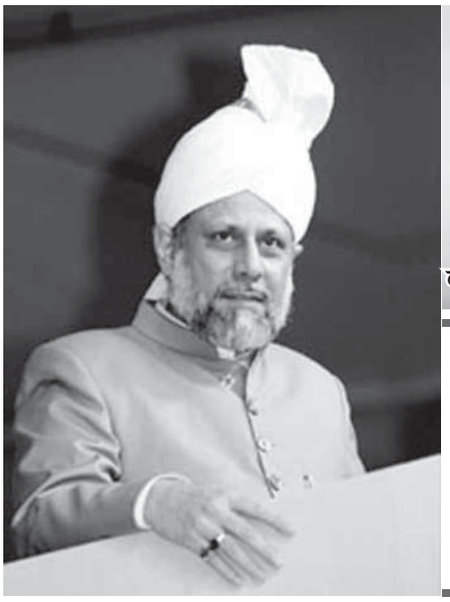

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক

নাম-সর্বস্ব মৌলবীরা আশা করুক আর না-ই করুক ইসলামের সজীবতার যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর (আ.) জামা'তের সাথে সুসংবদ্ধ

পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে

যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে

তাশাহ্হুদ, তাঊজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(আল-ইনশেরাহ:৬-৭)

অর্থ: অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আমি যে আয়াত দুটি পাঠ করলাম এগুলো সূরা আল-ইনশেরাহ্ এর। অনেকেরই এটি মুখস্ত আছে। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দীর্ঘ তের বছর অবর্ননীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দরিদ্র সাহাবীদের উপর যে নির্যাতন চলত তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সর্বদা ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইয়াসের (রা.) ও তার পরিবারের উপর নির্যাতনের এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের উপর নির্যাতন চলছিল, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নির্যাতন দেখে বললেন, **"সাবরান আ-লা ইয়াসের ফাইন্না মাওয়েদাকুমুল জান্নাত"** (মুসতাদরেক, খন্ড-৪, কিতাব-মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেবে আম্মার বিন ইয়াসের পৃ-৯৯, হাদীস-৫৭৩২) অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্য ধারন কর। এসব কষ্টের বিনিময়ে খোদা তাআলা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করছেন বা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এরপর এ নির্যাতনের মধ্যেই এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু এ থেকে মুক্তি দিতে পারত না। মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অন্যদিকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সুসংবাদও দেয়া হচ্ছিল যে,'সব দুঃখ-কষ্টের পরই এক মহা সাফল্য নির্ধারিত আছে। এবং নিশ্চয় সব দুঃখ-কষ্টের পর আরেকটি বিজয় নির্ধারিত আছে।' দুঃখ-কষ্ট, প্রাণের কুরবানী এবং নির্যাতনের সংকটময় এ অবস্থা তো আছে। কিন্তু এই এক একটি নির্যাতনের বিপরীতে বিজয়ের একটি ধারা আরম্ভ হবে। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে, এসব দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতীতগণ শুধু সমগ্র আরবেই বিজয়ী হয়নি, বরং আরবের গন্ডি পেরিয়ে বড় বড় রাজত্বকে পরাজিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং

মাধ্যমে দলিল পেশ করত যে কষ্টের এ শতাব্দীর বিপরীতে চতুর্দশ শতাব্দী আসবে স্বাচ্ছন্দ্যের । কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে চতুর্দশ শতাব্দী যখন এসে গেল এবং শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীদার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হল । পৃথিবী ও আকাশ তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল, তখন এসব আলেমগণই সর্বপ্রথম তাঁকে অস্বীকার করল।" (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩২৭, পাদটীকা)

অতএব, আলেমদের আচরন ও রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এখন তারা এটিও বলতে শুরু করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসার প্রয়োজনই নেই। নেতা রূপে আমরাই যথেষ্ট অর্থাৎ এসব নামধারী ওলামা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথ-প্রদর্শক বানান সে-ই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। স্বঘোষিত পথ-প্রদর্শকগণ প্রকৃত পথ-প্রদর্শক নয়। নয়তো যাদের শুধু পার্থিব জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কথা-বার্তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে এতে ঐশী নেতৃত্বের নূরের ছিটে ফোটাও নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একজন বড় স্কলার (বিজ্ঞ ব্যক্তি) বলে কথিত যার ডক্টরেট ডিগ্রীও রয়েছে এবং তাকে ডক্টর-ই বলা হয়।

তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী এবং ইসলামী চিন্তাধারা কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ এসেছে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি গ্রাউন্ড জিরোতে মুসলমানদের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন, কেননা বর্তমানে গ্রাউন্ড জিরোর যে controversy রয়েছে, যে বড় সমস্যা চলছে, তবে মুসলিম উম্মাহ্ তাকে খলীফাতুল মুসলেমীন এবং আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নিবে। যে চিন্তা করে বা যে হিসাব বা অংক কষেই তিনি এ বিবৃতি দিয়ে থাকুন, তার বুদ্ধি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হতে হয়। এসব মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টির এ-কী হাল? এসব মুমিনদের 'খলীফাতুল মুসলেমীন' এমনই হওয়া প্রয়োজন। আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলেমীনের জন্য তারা এটি, কি মানদন্ড নির্ধারন করেছে? কোন ধরনের মানদন্ডের ভিত্তিতে তারা তা বানাতে চায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে না মানার কারণে তাদের চোখও প্রত্যেক বিষয় পার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে । এ কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায়, অন্ধকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও তারা বলে, আমাদের এখন কোন মসীহ্ ও মাহ্দীর প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর দয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,'ইসলাম বড় বড় বিপদের দিন অতিক্রম করেছে। এখন এর হেমন্ত পার হয়ে বসন্তকাল চলছে। 'ইন্না মাআল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু মোলাগণ চায়না যে এখন ইসলাম পুনরায় সজীব ও প্রাণবন্ত হোক।' (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃ-১৬৫)

অতএব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের কষ্টের যুগ শেষ হয়েছে। যুগের মসীহ্ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাকে উজ্জ্বলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্শত্রুদের সৃষ্ট সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহমদীয়াতের কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যেও সৎ প্রকৃতির লোকগণ যুগ ইমামের হাতে সমবেত হয়ে সেই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারন করছেন যা দল উপদলের বিভক্তি থেকে মুক্ত প্রথম যুগের মুসলমানগণ অবলম্বন করেছিলেন, যেটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। এসব আহমদী মুসলমান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন যার আমলী (বাস্তব) উদাহরণ সাহাবীগণ (রা.) আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। যারা অনেক কুরবানী করেছিলেন, প্রাণের কুরবানী পেশ করেছিলেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। যারা ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দ্বিধায় সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। যারা খোদা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছিলেন।

আজ শুধুমাত্র আহমদীগণই এ নমুনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করছে। যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা সমুন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে কেবল প্রস্তুতই নয়, বরং করেও যাচ্ছেন। আমরা এ দৃষ্টান্ত ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্রে দেখতে পাই যেখানে আহমদীয়াত বিরোধীরা ইসলামের নামে লোকদের হৃদয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিষ ঢালছে। আবার কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের কিছু অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব দুস্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু এসব কষ্ট আহমদীদের ঐসব কুরবানীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয় যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও কষ্ট ছিল, আবার স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। বিশ্ববাসী এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। মদীনা এসেও সেই কষ্টের যুগ শেষ হয়নি। বিরোধিতা ও ফিতনা শেষ হয়ে যায় নি। মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতারনা করে শহীদ করা হয়। বি'রে মাউনার বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যখন ধোকা দিয়ে একটি গোত্র সত্তর জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করে। রজী নামে একটি ঘটনা বিখ্যাত। এতেও ধোকা দিয়ে দশ জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়। বর্ণনা অনুযায়ী এ দুটি ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই সময়ে জানতে পারেন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৪৭৬) এতে তিনি (সা.) খুবই দুঃখিত হন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৫০৩)।

বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত এসব যালেমদের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে দাড়িয়ে এ দোয়া করতেন,'হে আমার প্রভু! তুমি এ অবস্থায় আমাদের প্রতি করুণা কর এবং ইসলামের শত্রুদের হাত প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে ধ্বংশের জন্য নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্তপাত করে চলছে। (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ-৫২১) অতএব, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ একই সাথে চলতে থাকে। একদিকে মুসলমানদের রক্ত বইতে থাকে, অন্যদিকে নবাগতদের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টের পর মুসলমানগণ একটি বড় বিজয় লাভ করতে থাকেন। এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্য প্রেমিকরূপে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। সব কষ্টের পর বিজয় অবধারিত হবার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা দু'বার দিয়েছেন তা এজন্য যে, যে দৃশ্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ দেখেছিলেন তা তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও প্রকাশিত হবে। নামধারী মৌলভীগণ প্রত্যাশা করুক

কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে এক বৃহৎ শক্তি রূপে বিরাজমান থাকে। আজ মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দাসত্বে গর্ব অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এটি গর্ব করারই যোগ্য। আজ ভূ-পৃষ্ঠে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই নেই যে আমরা শেষ যুগের নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত যেমন ঘোষনা করে যে কষ্টের যুগও আসে। তাই কষ্টের যুগ আসবে এবং এসেছেও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমার উম্মতের উপর একটি অন্ধকার যুগ আসবে যখন তাদের সেই সম্মান, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ আমরা দেখছি, কত সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে বসেছে।

আজ তারা প্রতিটি জিনিষের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের সম্পদও এখন অন্যের দখলে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা তেল উত্তোলন করতে বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে সক্ষম হতে পারছি না। এ হচ্ছে পার্থিব অবস্থা। আর ধর্মের অবস্থা কি? নামধারী আলেমগণ ধর্মকে বিকৃত করে এতে বিদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি করেছে। আজ সেই ইসলাম নেই যা রাসূলুলাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং এ ইসলাম যা বর্তমান নামধারী আলেমগণ পেশ করছেন, এ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। ঈমানের আবেগ অবশ্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমল (বাস্তবায়ন) থেকে তা বহু দূরে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে। কথিত জিহাদের অস্ত্রাদীর জন্যও মুসলমানগন আবার সেই অমুসলিমদেরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেছেন,'আল্লাহ্ তাআলা যদি এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দিতেন, তবে মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী করতেন না।' (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃ-১৯০)

অতএব, বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে। শুধু তাই নয়, জিহাদ এবং ইসলামের নামে জিহাদের এমন অপব্যবহার করা হচ্ছে যে নির্যাতন ও বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। ইসলাম সেই অতুলনীয় ধর্ম যা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও শুধু এজন্য পেয়েছিল যে কাফেরদের যদি তখন প্রতিহত করা না হতো তবে কোন গির্জাও নিরাপদ থাকবে না। ইহুদীদের কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। অন্য কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। মসজিদ সমূহও নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এরা এমন জিহাদী যারা খোদার নামে খোদারই ঘরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করছে। নির্দ্বিধায় তারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যুদ্ধচলাকালীন সময়েও কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন নারীকে হত্যা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ যারা নিজেদের উপাসনালয়ে ইবাদতে মগ্ন এবং উপদেশ দানরত, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। জাতীয় সম্পদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট করবে না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব-ফী দোয়াইল মুশরিকীন, হাদীস ২৬১৩-২৬১৪, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কিন্তু বর্তমান যুগের জিহাদীগণ তো স্বজাতি ও কলেমা পাঠকারী লোকদের সাথে এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরন করছে যা দর্শনে ও শ্রবনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। তাও আবার খোদা ও রাসূল (সা.) এর নামে তারা এসব করছে। নিশ্চয় এহেন কর্মের জন্য তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি অর্জন করে ধৃত হবে এবং হচ্ছেও। কেবল জঙ্গী সংগঠনগুলোই নয় যাদের সাধারনত সর্বত্রই ধীক্কার জানানো হয়, বরং আহমদীদের উপর এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আহমদী-বিরোধী আলেমগণও অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু আলেমগণই নয়, কিছু রাষ্ট্রও এ নির্যাতনের সাথে জড়িত। তারা অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

এটা কি সেই কষ্টের যুগ, যে সম্পর্কে খোদা তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেছিলেন যে আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, ক্ষমতা লাভের পর মুসলমানগণ নিজেরাই কাল নির্যাতন করায় লিপ্ত হবে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো না। যেমন আমি বলেছি, সেই মক্কার যুগ কষ্টের ছিল যার পর আল্লাহ্ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এর এক যুগ পর পুনরায় কষ্টের যুগ এসেছে, যার পর আল্লাহ্ তাআলা পুণরায় স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ ধর্মীয় উন্নতির ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পর আরম্ভ হবার ছিল এবং সেটি হয়েছেও। কিন্তু যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেনি তারা এখনো অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মসীহ্ মাওউদকে মান্যকারীদের কষ্টে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে। তারা দিনরাত এ চেষ্টায় লিপ্ত যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। উম্মতের জন্য এরচেয়ে বড় দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, যে অন্ধকার থেকে নিস্কৃতি এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদ কে প্রেরন করেছেন, মুসলমানগণ সেই মসীহ্ মাওউদ এর জামা'তের উপর অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের কষ্টের যুগ দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আহমদীয়াত বিরোধীরা মনে করে যে তারা আহমদীদের কষ্টে নিপতিত করছে।

আহমদীদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব কষ্টকর অবস্থার পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাদের ধারনায় আহমদীয়াতকে ধ্বংশ করার জন্য যেসব বিরোধীতা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, এসব প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত উন্নতির উচ্চতর সিড়িতে পা রাখছে, আর বিরোধীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তবুও লোকেরা বুঝতে পারছে না এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় পোষাকধারীদের হাতের খেলনা হয়ে চলেছে। মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে কেউই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা তাআলা আমাদের বিরোধী আলেমদের অবস্থার উপর করুণা করুন। তারা যেসব কাজ করছে তা ধর্মের জন্য ভাল নয়, বরং অত্যন্ত ভয়ানক। তারা সেই সময়কে ভূলে গেছে যখন তারা মিম্বরে চড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে একের পর এক ধীক্কার জানাত এজন্য যে, এ শতাব্দীতে ইসলামের ভীষন ক্ষতি হয়েছে। তারা কুরআনের আয়াত **"ফা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা"** পাঠ করে এর

বা না করুক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের জন্য ইসলামের জীবন্ত ও সতেজতার যুগ নির্ধারিত আছে। শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট যেমন দেয়া হচ্ছে, তেমনি বিজয়ও পূর্বের চাইতে অধিক মর্যাদায় প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথেও আল্লাহ্ তাআলা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন নি, এমনকি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীও করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাকে বলেছেন,' বা'দাল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'কষ্টতো আছে কিন্ত তা অল্প, এরপর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয় নির্ধারিত আছে'। ব্যাখ্যামূলক এ অনুবাদ আমি এজন্য করেছি যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষাবিদদের মতে **'আল-উসর্'** শব্দ ব্যবহার করে কষ্টকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং **'ইউসর'** কে এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক কাঠিন্য, প্রত্যেক কষ্ট অগনিত বিজয় নিয়ে আসবে এবং এটিই ঐশী জামা'তের বৈশিষ্ট্য। এ দ্বীনকে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার সব নিদর্শনও আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কেন দৃঢ় বিশ্বাসী হব না যে বিরোধী ও আলেমগণের বিরোধিতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রাণ কুরবানীর ফলে জাতি ধ্বংশ হয় না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে যখন কুরবানী করার অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রাণ কুরবান করা হয়, তখন তা জাতি ও জামা'তের আয়ু দীর্ঘায়িত করে। তার শক্তি বৃদ্ধি করে। আর খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যখন এসব কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করে ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকে, তখন কুরবানী ও কষ্ট সমূহ একেবারেই নগন্য মনে হয় এবং এক নতুন মর্যাদার সাথে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবীর বহু পূর্বেই খোদা তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন এবং সান্তনা দিতে থেকেছেন যে আমি তোমাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাচ্ছি, তা যত কঠিন কাজই হোক, আমি তোমার সাথে আছি এবং তুমি সাফল্য ও বিজয় দেখতে পাবে। একবার এ আয়াতের মাধ্যমে ইলহামরূপেও তাঁকে বলেন, **"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লেইয়াগফিরা লাকালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বেকা ওয়ামা তাআখ্খারা।"** বারাহীনে আহমদীয়াতে এর ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, অর্থাৎ দান করব এবং মাঝে যেসব কষ্ট কাঠিন্য ও বিপদাবলী রয়েছে, সেগুলো এ উদ্দেশ্যে যেন খোদা তাআলা তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট ছাড়াই মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত এবং খুব সহজেই মহা বিজয় লাভ হত। কিন্তু দুঃখ কষ্ট এজন্য যে এগুলো উন্নতি এবং গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার উপায় স্বরুপ।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'আজ এ প্রেক্ষিতে এ অধম যখন শুদ্ধকরনের উদ্দেশ্যে খাতা দেখছিলাম (যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখছিলেন) তখন কাশ্‌ফী অবস্থায় কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার হাতে দেয়া হয় এবং তাতে লেখা ছিল, **'বিজয়ের ডঙ্কা বাজে'**। এরপর একজন মৃদু হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখিয়ে বলল, দেখ তোমার ছবি কি বলে। আমি দেখলাম, সেটি এ অধমের ছবি। ছবিতে অধমের পোষাক ছিল সবুজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় খুব প্রতাপশালী লাগছিল। ছবির ডান ও বাম দিকে **"হুজ্জাতুলাহুল কাদির ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার"** লেখা ছিল।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১, পৃ-৬১৫)

অতএব, এ সুসংবাদের আলোকে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে আহমদীয়াত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যেসব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয় বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এগুলোর দ্বারা জামা'তে আহমদীয়ার কোন ক্ষতি হবে না। শত্রুদের ষড়যন্ত্র সমূহ ব্যর্থ হওয়া, তারা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্জিত না হওয়া, এটি বিজয়ের চিহ্ন এবং বিজয়ের দিকে ধাবিত হবার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করছে। কিন্তু বিজয়ের ডঙ্কা কি? সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক মহা বিজয় হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী সেটি দর্শন করবে। সেটি বাজবে, অবশ্যই বাজবে। শত্রুরা, যারা সময়ে সময়ে আহমদীদের কষ্ট দেয়, তা মিশরেই হোক বা ইন্দোনেশিয়াতে, মালেয়শিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে, হিন্দুস্তানে হোক বা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের একটি ছোট জামাত যা বহু দূরের একটি উপজেলায় অবস্থিত, যার নাম চাঁনতারা, সেখানে মসজিদ সম্প্রসারনের কাজ চলছিল।

মসজিদ নির্মান চলাকালীন সময়ে এসব দাঙ্গাবাজ যাদের মধ্যে মৌলভীরাও ছিল, আক্রমন চালিয়ে লোকজনদের শুধু আহতই করেনি, বরং মসজিদও ভেঙে ফেলেছে। আহমদীদের ঘরবাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তারা এসব দরিদ্রদের জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়। পুরুষদের গুরুতর আহত করে। জামাতী কেন্দ্র ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি যখন সেখানে যায় এবং নারীদেরকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে, নারীরা সাধারনত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু এক নারী হেসে বলে, এরা আমাদের যতই ক্ষতি করুক, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ নারী এ কষ্টে কেঁদেও ছিল যে আমরা এখন মসজিদ নির্মান করতে পারব না। আমাদের কাজ কিছুটা থেমে গেছে। আর পাকিস্তানে তো নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ঐ ইহিতাস রচিত হচ্ছে যে মনে হয় এদের খোদা তাআলার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে খোদা তাআলার নামে এ নির্যাতন অব্যাহত রাখত না। গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে শহীদ করা হয়েছে। যালেমরা তো একদিনেই ছিয়াশি জনকে শহীদ করেছে। এসব যালেমদের দৃষ্টিতে আহমদীদের রক্ত এতই সস্তা যেন এর কোন মূল্যই নেই। তাদের ধারনায় নাউযুবিলাহ্ খোদা তাআলাও এ রক্তপাতের ব্যাপারে উদাসীন।

কিন্তু এসব রক্তপাতকারীদের স্বরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তাআলা এসব যালেমদের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব নিবেন, অবশ্যই নিবেন। এবং এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু কবুল করে এমন ভাবে পুরস্কৃত

করবেন এবং পুরস্কৃত করেও যাচ্ছেন যে এটি আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'ফাতহাম্ মুবীনা'** অর্থাৎ মহা বিজয়ের নিকটতর করছে। লাহোরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, পরিচিতি হয়তো পূর্বেও ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, জামা'তের প্রতি যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি আকর্ষন ও পরিচিতির জন্য আমরা যদি পূর্বে আমাদের উপকরনাদীর মাধ্যমে চেষ্টা করতাম, তবে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেত। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ শহীদগণ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে কেবল পরজগতে চিরজীবন লাভ করেননি, বরং তাদের প্রাণ কুরবাণী করে এ জগতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে গেছেন। বাণীতো আল্লাহ্ তাআলা পৌঁছাবেন। পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন এবং পৌঁছিয়ে যাবেন। কিন্তু মাধ্যম আল্লাহ্ তাআলা বানান। এসব শহীদগণকে এ বাণী পৌঁছানোর একটি খুব শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়েছেন তিঁনি। অতএব, এসব কুরবানীকারীগণ খুব সৌভাগ্যবান।

সম্প্রতি পাকিস্তানে কয়েক ডজন অ-আহমদী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী লোক সন্ত্রাসীদের যুলুমের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, শিশুরা এতীম হচ্ছে, নারীরা বিধবা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা যুবক সন্তানদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নিহতরা জানেনা যে কেন তাদের হত্যা করা হয়েছে? তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও জানেনা যে আমাদের প্রিয়দের কেন হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হচ্ছে? কিন্তু পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

শহীদদের পরিবারবর্গ, সন্তান, বিধবা স্ত্রীগণ, পিতামাতাগণ জানেন যে আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। প্রাণের কুরবানী পেশ করে তারা যেমন তাদের প্রাণ চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন, তেমনি তারা পেছনে যাদের রেখে গেছেন তাদের মাথা গর্বে উঁচু করে গেছেন। এ বিষয়ে আমার কাছে বেশ কিছু চিঠি এসেছে, আসে এবং প্রায়ই আসছে। তারা লিখেছেন, আমরা তো জানতামই না যে আমাদের প্রিয়গণ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মর্যাদা কত বাড়িয়ে গেছে। এটি তো ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু জামা'তের যে লাভ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ্, তন্মধ্যে আহমদীদের ঈমানী দৃঢ়তা লাভও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়েও আমার কাছে কিছু চিঠি আসে যে এ কুরবানী সমূহের মাধ্যমে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের আকাংখা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব শিথিলতা ছিল সেগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, জামা'তের তবলীগের ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব, **যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে।** আহমদীদের এ কষ্টকর অবস্থা বলে দিচ্ছে যে এখন 'উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময়। যার বিনিময়ে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ইউসর' অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে এ কুরবানী সমূহ উজ্জ্বল এক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

ইনশাআল্লাহ্ এ মহা বিজয়ের ডঙ্কা বাজবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **ভবিষ্যতে যখন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হবে বা বিজয় লাভের আনন্দ উৎসব পালন কালে আহমদী শহীদগণের স্মৃতিকে ইতিহাস সর্বদা জাগরুক রাখবে। বিশ্ববাসীকে বলা হবে, আজ তোমরা যে বিজয়ের আনন্দ বা ঈদ উদযাপন করছ তা ঐসব কুরবানীর বিনিময় স্বরূপ যা শহীদগণ তাদের রক্ত দিয়ে প্রদান করেছেন। শত্রুরা আহমদীদের রক্ত সস্তা মনে করে । এ রক্ত তো প্রতিদিন তার মূল্য বাড়িয়েই চলছে।**

ইসলামের প্রথম যুগের শহীদদের কুরবানী সমূহকে ইতিহাস আজও ভূলেনি, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরনের চেষ্টাকারীদের কুরবানী সমূহকেও ইতিহাস কখনো ভূলবে না। অতএব, শহীদদের স্ত্রী সন্তান, পিতামাতা, ভাইবোন বরং আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা জরুরী। তারা যুগ ইমামের চিন্তা দূর করে তাদের রক্ত দান করে জামা'তের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের নতুন পন্থাও শিখিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে আত্মার পবিত্রতার জন্য যেখানে আমরা রমযানে বৈধ জিনিষগুলো কুরবানী করি, আর এর পর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করি, সেখানে আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রমযানে নিজেদের প্রাণ কুরবাণী করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারীতে পরিনত হয়েছে এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্যাদা লাভ করেছে। যদিও যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের জন্য এটি খুব কষ্টদায়ক। আপনজনদের বিচ্ছেদের দুঃখ তো ভূলা যায় না। যখন কোন আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, যখন ঈদ আসে, তখন এ মর্ম-পীড়া আরো বেশী জাগ্রত হয়।

গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত এ বছরে ৯৭ জন শহীদ হয়েছেন। অনেক বিধবা রয়েছেন যারা তাদের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করছেন। ঈদ সত্ত্বেও তারা বেদনা-ভারাক্রান্ত। এমন সন্তান আছেন যারা এ বছর ঈদে তাদের পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক মা আছেন যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঈদ মুবারক বলতেন, কিন্তু এ বছর তাদের কবরে গিয়ে দোয়া করে নিজে হৃদয়ে সান্তনা খুঁজবেন। অনেক এমন পিতা আছেন যারা তাদের ছেলেদের সহায়তায় ঈদের নামায পড়তে যেতেন। এখন অন্য কারো সহায়তায় তাদের কবরে দোয়া করতে যাবেন।

এটি এমন পরিস্থিতি যে রক্ত সম্পর্কীতদের বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও আজ অস্থির করবে এবং ঈদের আনন্দের স্থলে দুঃখকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, রমযানে ও ঈদের দিন পৃথিবীতে কত মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ধৈর্য্য ধারন করতে হয়। এ শহীদদের মৃত্যু তো জামাতকে জীবন দানের জন্য হয়েছে। এ শহীদগণ তো তাদের প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য

প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে আজ আমাদের ঈদ উদযাপন না করার কোন কারন নেই। যখন আমরা ঈদ উদযাপন করব এবং এ ঈদের দিন হৃদয়ের কষ্ট সমূহকে খোদা তাআলার সমীপে পেশ করব, তখন এ দোয়া সমূহ এ শহীদদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং আমাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরন সৃষ্টি করবে। কষ্টের সময়িক যুগ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের দীর্ঘ যুগে পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঈদ সম্পর্কিত ইলহাম সমূহ আমাদেরকে ঈদের খুশির সংবাদ দেয়। এজন্য এ প্রশ্নই উঠে না যে আমরা আল্লাহ্ তাআলা ঈদের যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন তা উদযাপন করব না এবং ঐ আনন্দে অংশ নেব না যা খোদা তাআলা এ যুগের ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে,'আমদন ঈদ মোবারক বাদত' ঈদ তো রয়েছে তা পালন করো বা না করো। (তাযকেরা, পৃ-৬২৬, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম ফার্সী অংশের অনুবাদ হচ্ছে, ঈদের আগমন তোমার জন্য কল্যাণময় হোক।

অতএব, ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারনে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে। নয়তো আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ঈদের উপকরন তো সৃষ্টি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে যে বিজয় সমূহ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার উপকরণ তো হয়েছে। এখন তাকে মান্যকারীদের জন্য ঈদ কল্যাণময়। আর যারা তাঁকে মানেনি তারা বঞ্চিত থাকবে। ঈদের সাথে বিজয়ের সংবাদ শুনিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **'আল-ঈদুল আ'খারু তানা'লু মিনহু ফাতহান্ আযীমা'** (তাযকেরা, পৃ-৫৮৬, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪) অর্থাৎ আরেকটি ঈদ রয়েছে যাতে তুমি এক বড় বিজয় লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় সমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আবার এ সুসংবাদও ঈদের সাথে এবং ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছেন, তবে আমরা কেন আমাদের দুঃখ ভূলে গিয়ে যুগ ইমামের সাথে মহা আনন্দে অংশ নেব না। আমাদের এ দুঃখজনক অবস্থায় খোদা তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্গত অশ্রুও রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শত্রুদের নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ অনুযোগ করে না। নিশ্চয় এ অশ্রু আমাদেরকে বিজয়ের নিকটবর্তী করার কারন হবে।

পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে। তাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা যে বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে এসবের মোকাবেলা করছে, এজন্য বিশ্বের সব আহমদীদের তাদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও যে মনোবলের সাথে তারা ঈদ উদযাপন করছে, প্রকৃত ঈদ তো তাদেরই। হয়তো বহির্বিশ্বের সব আহমদীগণ জানে না যে শত্রুদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এর একটি তাজা উদাহরণ, মর্দান মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বড় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের নিরাপদে রেখেছেন। আমরা ঐসব লোকদের দেখে নিয়েছি যে তারা কিরূপ চেষ্টা করছে। এসব আহমদীদের মসজিদে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাহসের কাজ এবং প্রাণ কুরবানীর জন্য সর্বদা তৈরী থাকার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। পুরুষগণ তো মসজিদে এসে থাকে, কিন্তু ভয়ের আশংকা থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশুদের মসজিদে আসা এবং এক স্থানে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যে কারনে আমার কাছে কয়েকজন নারী অস্থিরতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন।

সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা যে পাকিস্তানে নারী ও শিশুদের ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক স্থানে সমবেত হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারনে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে জন্য আমি বলেছি শিশু ও নারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমি এসব নারী ও শিশুদের বলছি, শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের জন্য তোমাদের মসজিদে যেতে বারন করা হয়েছে এবং ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়তে বারন করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এটি করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক উপকরন এবং নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ করাও মানবিক দায়িত্ব ও শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত। যদিও আপনারা মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাদের গৃহকে তো দোয়া ও কান্নাকাটি দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। আপনাদের ঘরগুলোকে দোয়া ও কান্নাকাটিতে এমনভাবে পূর্ণ করে দিন যেন খোদা তাআলা স্বয়ং আপনাদের হৃদয়ে সান্তনা দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দীগণ! হে আমার বাচ্চাগণ! **'ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা'** অর্থাৎ 'জেনে রাখ নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।' আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

অতএব, এ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং নিশ্চয় আসবে। তোমাদের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির দিন নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে পরিবর্তিত হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখাবে। অতএব, তোমরা নিজ প্রভুর সমীপে বিনত হওয়া ও কান্নাকাটি করা থেকে কখনো ক্লান্ত হয়ো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'ছেলেরা বলে কাল ঈদ, নয় তো পরশু হবেই।' (তাযকেরা, পৃ-১৬১, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪)

অতএব, আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয় । সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

জার্মানী জলসার একটি অধিবেশনে জার্মানদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য ছিল। অ-আহমদী এবং অমুসলমান জার্মানগণও এসেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভাবতে পার। কিন্তু আমরা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, যে জামাত আল্লাহ্ তাআলা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটিই এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ অটল নিয়তিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তা হবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নয়, ত্রাস সৃষ্টি করে নয়, নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে নয়, কারো সম্পদ ও জমি জবর দখল করে নয়, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করে নয়। বিশুদ্ধ অন্তরে পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য এটাই এবং এটি অতিকথন নয়। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এটি পূর্ণ করবেন। যখন পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐ দিনই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আহমদীগণ শহীদ হচ্ছে, বিভিন্ন কুরবাণী করছে, নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে গৃহহীন হচ্ছে, তবে এ ঈদকে স্বাগত জানানোর জন্য যা আহমদীয়া জামা'তের জন্য নির্ধারিত আছে, আহমদীয়া জামা'তের জন্য বাহ্যত দৃষ্ট এ রাত সমূহ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে কদরের রাত্রি (সৌভাগ্যের রজনী) যা ঈদের খুশীর পূর্বে প্রতি রমযানেও আগমন করে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষদের যুগেও এসে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরন আমি আমার খুতবাতেও বর্ননা করেছি। এসব রাতই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে মহা বিপ্লব ঘটায় এবং এরপর এক ঈদ নয় বরং ঈদের এক ধারা আরম্ভ হয়।

আজ পাকিস্তান বা অন্য কিছু স্থানে জামা'ত কষ্টের যুগ অতিক্রম করছে, তাতে কি? যে কষ্টের যুগ তারা অতিক্রম করছে, এ দুঃখ-কষ্ট তো আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের পথ প্রদর্শন করছে। অতএব, এ বিষয়টি স্বরণে রেখে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার করুণা, সাহায্য ও তাঁর সাক্ষাত যাচনা করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী করেছেন, যেজন্য বাহ্যত ঘর সমূহে দুঃখকর অবস্থা বিরাজমান, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ, এ দুঃখ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিন। এ দোয়া করুন যেন আমাদের ধৈর্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে গৃহীত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববাসী দেখবে কুরবানী সমূহ ও শহীদদের রক্ত কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন আজ আমরা এ দোয়া করি, আমাদের ধৈর্য ও মনোবল যেন আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা আকষণ করে। তাঁর কৃপা বৃষ্টি যেন পূর্বের চেয়ে অধিক বর্ষিত করার কারন হয়।

খোদা তাআলা যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ, খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যা প্রকৃত ঈদ, সেটি দান করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের সকলকে আজ ঈদের প্রেক্ষিতে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয়। সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আহমদী শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সদিচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তানের অধিবাসী সব আহমদীদের নিজ হিফাযতে রাখুন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন। মালী কুরবানীকারীদের সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তানে জামা'তের সদস্যগণ জামাত ও জামা'তের স্থাপনা সমূহের নিরাপত্তার জন্য যে কুরবানী করছেন, তাদের জান-মালের হিফাযতের জন্যও দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য খুব দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। সবাই নিজেদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তার খাঁটি ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিনত করেন।

[খুতবা সানীয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর বলেন:]

আমি বিনীতভাবে আরেকটি ঘোষণা করছি, বরং ক্ষমা চাচ্ছি যে সাধারণত এ ঈদে আমি প্রত্যেকের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করি। কিন্তু গত চার পাঁচদিন যাবৎ আমার বাহুতে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে যে করমর্দন না করাই উত্তম। খুব শক্তিশালী ব্যাথা নাশক ওষুধ খেয়ে এখনো ঠিক আছি। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় কাজে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারনা চার পাঁচ হাজার লোকের সাথে করমর্দন করলে হয়তো ব্যথা কিছু না কিছু বেড়ে যাবে। এজন্য আমার ধারনা সতর্কতার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শও এটাই যে করমর্দন না করাই উত্তম। এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমস্ত হলে গিয়ে সবাইকে আমি অবশ্যই ঈদ মোবারক জানাব।

আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা বসে থাকুন বা জামাতী কোন প্রয়োজনে বসার প্রয়োজন থাকলে বসুন, নয়তো অবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সকলের হাফেয হউন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ্।

অনুবাদঃ **মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার আহমদী

[আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৪৫তম জলসা সালানা ২০১১-এ প্রদত্ত এ বক্তৃতা]

বক্তা: **শেখ মোজাফ্‌ফর আহমদ জাফর**
সদর, মজলিস ওয়াকফে জাদীদ, রাবওয়াহ্॥

অধমের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার আহমদী'।

ধর্মের ইতিহাস আমাদেরকে অবহিত করে যে, খোদার সাথে যখন বান্দার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায় আর সৃষ্টি তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে হীন থেকে হীনতর পথ অবলম্বন করে। উন্নত মানবিক গুণাবলী হারিয়ে যেতে আরম্ভ করে আর নৈতিকতা বিনাশ পেতে আরম্ভ করে। মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ অনুপ্রবেশ করতে থাকে। আর মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা থেকে পতিত হয়ে কান্ডজ্ঞানহীনের পর্যায়ে পৌঁছতে আরম্ভ করে। ফলে বিশ্ববাসী **'যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররে ওয়াল বাহ্‌রে'** (সূরা আর্ রূম:৪২) অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে। এর বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত হয়, তখন এই আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব ও উত্তাপ ও আকাল দূর করার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় যা পিপাসার্ত আত্মাগুলোকে পরিতৃপ্ত করে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং পথহারাদের পথের দিশা দেয়। এই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব নবীর আগমন এবং তাঁর পবিত্র করণ শক্তির ফলে সাধিত হয়। আর একথাও সত্য যে, নবী ছাড়া এ ধরনের বিপ্লব সম্ভবই নয়।

সম্মানিত সূধী।

আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যখন আরবের মরুভূমিতে আবির্ভূত হন তখনকার শোচনীয় বা বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার চিত্র ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, তারা কোন ধরনের মানুষ ছিল। তাদের আচার-আচরণ কেমন ছিল? ব্যবহার কেমন ছিল আর আদর্শই বা কি ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এর চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, স্থলে ও জলে সর্বত্র চরম নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল আর একারণেই সেই যুগকে জাহেলিয়্যাত বা অজ্ঞতার যুগ আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন মহানবী (সা.) আবির্ভূত হন এবং স্বীয় পবিত্র করণ শক্তি বলে একটি মহা বিপ্লব সৃষ্টি করেন, এটি এমন একটি বিপ্লব ছিল যা ইতোপূর্বে কোন চোখ দেখেনি আর কোন কোনও শুনেনি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এই বিপ্লবের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তা সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করে বলেন:

'সেই যে মরুর দেশ আরবে এক বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মুর্দা অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণ ফিরে পায়, প্রজন্ম পরম্পরায় বিপথগামী ও বিভ্রান্ত লোকেরা ঐশী রঙে রঙীন হয়ে উঠে, আর অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, বোবাদের মুখ থেকে ঐশী তত্বজ্ঞানের কথা ফুটতে থাকে। এবং একই সাথে পৃথিবীতে এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল যা ইতোপূর্বে না কোন চক্ষু দেখেছে আর না-ই কোন কর্ণ শুনেছে। জানো কি যে, তা কি ছিল? তা ছিল খোদার সত্তায় বিলীন এক ব্যক্তির অন্ধকার রাতসমূহের কাতর প্রার্থনা যা পৃথিবীতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর বিস্ময়কর ঘটানবলী প্রদর্শন করেছিল, যা সেই নিরক্ষর ও অসহায়ের পক্ষে অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হতো। হে আল্লাহ্! আশিস, কল্যাণ ও শান্তি বর্ষণ কর তাঁর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি তাঁর দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা অনুপাতে, তাঁর উম্মতের উপরও। এবং বর্ষণ কর তাঁর প্রতি তোমার রহমতের আলোক ধারা।' (বারকাতুদ দোয়া-রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খন্ড-পৃষ্ঠা: ১০-১১)

এই বিপ্লব শত শত বছর ধরে পৃথিবীতে স্বীয় প্রভার বিস্তার করতে থাকে, এবং পূর্ণিমার চাঁদ হিসেবে ভ্রষ্টদেরকে পথের দিশা দিয়েছে। পরিশেষে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আবার সেই জ্যোতি কুসংস্কারের অতলে হারিয়ে যায়। আসল ও প্রকৃত জিনিষ, সত্যতা ও বিশ্বস্ততা, খোদা ভীতি ও পবিত্রতা রূপকথার গল্পে পরিণত হতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় চিরায়ত সুন্নত অনুসারে পুনরায় কাদিয়ানের গন্ডগ্রাম থেকে ঐশী নূরের বিকাশ ঘটান আর দেখতে দেখতে অমানিশা দূরীভূত হতে আরম্ভ করে। আর ইসলামের উপর সেই সতেজতার দিন ফিরে আসে যা ১৪শত বছর পূর্বে এসেছিল।

তিনি ইসলামের সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা তুলে ধরেন। কুসংস্কারের পর্দা ছিন্ন করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরেছেন। এবং নিজ মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র করণ শক্তি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের নিদর্শন দেখিয়েছেন, আজও যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর আনুগত্যে বিলীন ও ভালবাসায় মোহিত হবে– সে অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য লাভ করবে। আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের রঙে রঙীন হয়ে ঐশী গুণে গুণান্বিত হবে। যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলেছে, **'সিবগাতাল্লাহি ওয়া মান আহ্‌সানু মিনাল্লাহি সিবগাতান'** (সূরা আল্ বাকারা: ১৩৯) অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র ধর্ম অবলম্বন করবো আর আর ধর্ম শেখানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে।

অতএব একজন সত্যিকার আহমদীর পদমর্যাদা মূলতঃ সাহাবীর মর্যাদাতুল্য। যদি কেউ চেষ্টা-সাধনা করতে চায়, যদি কেউ অনুশীলন করতে চায় (এটি তার জন্য)

আশিস মন্ডিত সে যে এখন ঈমান এনেছে,

যে আমাকে পেয়েছে সে সাহাবীদের সারিভূক্ত হয়েছে।

সাকী (পরিবেশনকারী বা আল্লাহ্) সে-ই সুধাই তাদেরকে পান করিয়েছে

অতএব পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমার শত্রুদের লাঞ্ছিত করেছেন।

প্রিয় সূধী!

এই রঙ ধারণের জন্য আর সাহাবীদের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য খোদাভীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। ইহকালে খোদার সাথে সাক্ষাত আর পরকালে মুক্তির লক্ষ্যে তাক্বওয়ার পানে পদচারণা আবশ্যক।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

প্রত্যেক পুণ্যের মূল হচ্ছে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি

যদি এই মূল ঠিক থাকে তাহলে সবই থাকলো।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'নিশ্চিত জেনো, খোদা অভিসম্পাত না করলে মানুষের অভিসম্পাতের কোন অর্থ নেই। যদি খোদা আমাদেরকে ধ্বংস করতে না চান তাহলে আমরা অন্য কারো দ্বারা ধ্বংস হবো না। কিন্তু তিনিই যদি আমাদের শত্রু হয়ে যান তাহলে কেউ-ই আমাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে না। আমরা কীভাবে খোদা তাআলাকে সন্তুষ্ট করব আর কি করে তিনি আমাদের সাথে থাকবেন? তিনি আমাকে বারংবার এর এই উত্তরই দিয়েছেন যে, তাক্বওয়ার মাধ্যমে। অতএব হে আমার ভাইয়েরা! চেষ্টা কর যাতে মুত্তাকী হতে পারো। আমল ছাড়া সব কিছুই মূল্যহীন আর নিষ্ঠা ব্যতীত কোন কর্মই গৃহীত হয় না। অতএব খোদাভীতি হলো, এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে থেকে খোদা তাআলার পানে অগ্রসর হও এবং পুণ্যের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পথকে দৃষ্টিগোচর রাখ। সর্বপ্রথম নিজ হৃদয়ে বিনয়, স্বচ্ছতা আর নিষ্ঠা সৃষ্টি করো আর সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকভাবে সহিষ্ণু, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিরহংকারী হয়ে যাও কেননা সব ধরনের কল্যাণ ও অনিষ্টের বীজ হৃদয়েই জন্ম নেয়, যদি তোমার হৃদয় কলুষমুক্ত থাকে তাহলে তোমার জিহ্বাও অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে, আর অনুরূপভাবে তোমার চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও। সর্ব প্রকার আলো বা অন্ধকার প্রথমে হৃদয়েই জন্ম নেয় তারপর ধীরে ধীরে তা গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই সর্বদা আত্ম বিশ্লেষণ করতে থাকো। যেভাবে পানখোর পানকে বারংবার চিবুতে থাকে আর উচ্ছিষ্ট বের করে ফেলে দেয়। অনুরূপভাবে তোমরাও নিজ হৃদয়ের গুপ্ত কামনা-বাসনা, প্রচ্ছন্ন অভ্যাস, আবেগ-অনভূতি এবং সুপ্ত প্রতিভাকে বারবার স্মরণ করতে থাকো, যে ধারণা, অভ্যাস বা প্রতিভার মাঝে খুঁত দেখতে পাও তা পরিহার কর, এমন যেন না হয় যে, তা তোমার**

পুরো হৃদয়কে অপবিত্র করে ফেলে আর অবশেষে তুমি নিজেই ধ্বংস হও।' *(ইযালায়ে আওহাম-রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড-পৃষ্ঠা: ৪৪৭-৪৪৮)*

উপস্থিত সুধী!

তাক্বওয়ার ফলে এই পদমর্যাদা লাভ হয়। যা সম্পর্কে হযরত (আ.) বলেন যে, 'তাক্বওয়া এমনই এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপন করা উচিত'। (আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা- রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড-পৃষ্ঠা:৩০৭)

তাক্বওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী এবং বক্তৃতাতে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি (আ.) তাঁর এক কবিতায় বলেন,

তাক্বওয়া একটি আশ্চর্যজনক রত্ন।

কল্যাণময় সেই ব্যক্তি, যার কাজই তাক্বওয়া অবলম্বন করা

শোন! ইসলামের সারকথা হলো তাক্বওয়া।

খোদার ভালবাসা হলো সুধা এবং তাক্বওয়া হলো পেয়ালা।

মুসলমানগণ! বিশুদ্ধ তাক্বওয়া অবলম্বন করো

যদি তাক্বওয়ায়ই না থাকে তাহলে ঈমান কোথায়?

এরপর খোদাভীতি অর্জনের জন্য ইবাদত অর্থাৎ নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং এর তাৎপর্য অনুধাবন করার ব্যাপারে বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে এটি বুঝিয়েছেন, প্রথাগতভাবে যেন নামায না পড়া হয় বরং হুযূর (আ.) বলেন, **'নামাযের পূর্বে যেভাবে বাহ্যিক অযু কর অদ্রুপে একপ্রকার আভ্যন্তরীণ অযুও করো এবং নিজের তনুমনকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত করো এরপর সেই দুই অযু সম্পন্ন করে দন্ডায়মান হও আর নামাযে অনেক দোয়া কর আর ক্রন্দন ও আহাজারিকে অভ্যাসে পরিণত কর যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়'**। (ইযালায়ে আওহাম-রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড-পৃষ্ঠা: ৫৪৯)

স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নামাযের প্রতি এই ভালবাসা ও সম্মান ছিল যে, মৃত্যু শয্যায় যখন চেতনা ফিরে পেতেন তখন সর্বপথম জিজ্ঞাসা করতেন, নামাযের সময় হয়েছে কি? তারপর তৈয়মুম করতেন, নামাযের নিয়্যত বাঁধতেন আর এই ফরয আদায় করার চেষ্টা করতেন যা পুরো জীবন তাঁর নয়ণের শীতলতা ছিল।

আর পুরো জামা'তকে স্বীয় পবিত্র কর্ম দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, এভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাস যে, জান্নাত বা দোযখের প্রতি দৃষ্টিও না পড়ে বরং শুধুমাত্র স্রষ্টার ভালবাসায় যেন হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। এ সময় রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনা মনে পড়ছে–একবার তিনি এক হাতে একটি পানির বদনা আর অন্য হাতে অঙ্গার নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এভাবে কেন যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমার মন চায় এই আগুন দিয়ে জান্নাতকে জ্বালিয়ে দেই আর এই পানি দিয়ে জাহান্নামকে শীতল করে দেই যাতে সৃষ্টি জান্নাতের লোভে বা দোযখের ভয়ে খোদা তাআলার ইবাদত না করে বরং কেবলমাত্র খোদা তাআলার ভালবাসায় মোহিত হয়েই খোদাকে ভালবাসে। হুযূর (আ.)-ও এ কথাই বলেন, তোমরা তাঁর কারণেই তাঁর উপাসনা কর কেননা এই উপাসনা তোমাদের কাছে স্রষ্টার প্রাপ্য। পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্যের শর্তে খোদা তাআলার ইবাদত করো না।

এরপর তাক্বওয়া লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালবাসা এবং এর শিক্ষার উপর অনুশীলন করাও সত্যিকার আহমদীর জন্য আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন এবং নিজ আমল বা কর্ম দ্বারা পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আর এর প্রভাব ও গুঢ়তত্ত্ব সন্ধানে ঘন্টার পর ঘন্টা পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করে এই শিক্ষা দিয়েছেন, যদি তাক্বওয়ার পথ পেতে চাও তাহলে খোদা তাআলার এই সর্বশেষ গ্রন্থের প্রতি শুধুমাত্র ভালবাসাই রেখ না বরং এতে বর্ণিত শিক্ষামালা নিজ জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করো। তাঁর ছেলে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের কাছে একটি পবিত্র কুরআন ছিল আর আমি অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে পারি যে, তিনি তা দশ হাজার বার তা পাঠ করেছেন।

সম্মানিত সুধি! এই যুগ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের যুগ, যাতে প্রবৃত্তির আশা-আকাঙ্খা আর কামনা-বাসনার প্লাবন ঈমানের ক্ষেত সমূহকে বিনষ্ট করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে আর অনেক সমাজে অপবিত্র কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আইনী নিরাপত্তাও প্রদান করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আবশ্যক হচ্ছে, একজন সত্যিকার আহমদী তাক্বওয়ার উন্নত মান অর্জন করার মানসে স্বীয় সম্ভ্রম ও ইজ্জতের সুরক্ষা নিশ্চিত করে সকল অপত্রিতা থেকেও নিজের আঁচল রক্ষা করা আর

পবিত্রতা ও শুদ্ধতা লাভের জন্য খোদা তাআলার প্রতি ভালবাসাকে আপন হৃদয়ে স্থান দেয়া, আর কোনরূপ শর্তে নয় বরং এই ভালবাসা ব্যক্তিগত আবেগ প্রসূত হওয়া উচিত।

শিয়ালকোটে চাকরীর যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পূর্ণ যৌবন কাল ছিল। সে যুগে তাঁর সম্ভ্রম ও পবিত্রতা সম্পর্কে বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক বিবরণ আহমদীয়াতের ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। লোকেরা বর্ণনা করেছে, তিনি যখন কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরে আসতেন তখন গলিপথ অতিক্রম করার সময় পাগড়ির প্রান্ত এমনভাবে চোখের উপর রাখতেন যাতে কোন না মাহরুমের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে আর যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন দরজার দিকে না ফিরে হাত পিছনে নিয়ে দরজা বন্ধ করতেন যাতে কোন না মাহরুমের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। অতএব তাঁর এই পবিত্র আদর্শ প্রত্যেক সত্যিকার আহমদীকে এই বাণী দিচ্ছে যে, সম্ভ্রম ও পবিত্রতার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার কুরআনী নির্দেশের প্রতি অনুশীলনের ফলে খোদার নৈকট্য লাভের সোপান দ্রুত অতিক্রম হয়।

তাক্বওয়া বা খোদাভীতি না থাকার কারণে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় আর সৃষ্টি হচ্ছে তা খুবই বিপদজ্জনক। একজন সত্যিকার আহমদীর জন্য চিন্তার বিষয়, যতি খোদা না করুন আমাদের সমাজে খোদাভীতিতে ঘাটতি দেখা দিতে আরম্ভ করে তাহলে আমাদের ও অন্যদের সমাজের মধ্যে আর কীইবা পার্থক্য থাকলো। কাজেই অনেক দোয়া ও উদ্বেগের সাথে আপন সত্তা, নিজ পরিবার-পরিজন এবং আশপাশের অবস্থা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত, খোদা না করুন তাক্বওয়ার বেলায় কোনরূপ দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে না তো। কেননা যেখানে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় সেখানকার সমাজের ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি হয় আর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বার্থপরতা ছড়িয়ে পরে। লোভ-লালসা ও আশা-আকাঙ্খার প্রবল তুফান বাড়ী-ঘরের শান্তি বিনষ্ট করে দেয়। ধন-সম্পদের লুটপাট রক্ত সম্পর্ককে ছিন্ন করে। যদি খোদাভীতি থাকে, খোদা তাআলার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকে তাহলে কেউই তার ভাইয়ের সাথে কলহ-বিবাদ করবে না। কখনোই উত্তরাধিকারদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি বা জায়গা-জমি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ হবে না। কেউ তার ভাইয়ের সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দিবে না আর হিংসাও করবে না। অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না আর অংশীদারদের মাঝে বিরোধ হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা হবে না। কেননা প্রত্যেকেই খোদার ভয়ে তাক্বওয়ার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে অপরকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে। বিনয় মানুষকে ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে রাখবে। লাঠালাঠি হবে না। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একটি বিষয়ে যখন দু'ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ চরমরূপ লাভ করছিল তখন লিখেছিলেন, তাদেরকে বলে দাও, হয় তারা মধ্যস্থতা করুক অথবা কাযা বোর্ডের আশ্রয় নিক তৃতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি তারা বিবাদ করে তাহলে নিযামে জামাত রীতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যদি খোদা ভীতি, বিনয় ও নম্রতা থাকে তাহলে এর সাথে আনুগত্যও অবশ্যই থাকবে। এরপর তোমার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে খিলাফত এবং জামা'তের অধীনস্ত করতে হবে। এরপর এমন উত্তর আসা উচিত নয়, **'জনাব! আমাদেরকে এই গাঁয়ে-ই থাকতে হবে আর এখানে এমন করা ছাড়া আমরা থাকতে পারবো না।'**

ইতায়াত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'আনুগত্য এমন একটি বিষয় যদি বিশুদ্ধচিত্তে অবলম্বন করা হয় তাহলে

হৃদয়ে একটি জ্যোতি এবং আত্মায় একটি তৃপ্তি ও দ্যুতি সৃষ্টি হয়। চেষ্টা-

সাধনার এতটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন। কিন্তু একটি

শর্ত আছে, তাহলো সত্যিকার আনুগত্য।'
(আল্ হাকাম-১০ ফেব্রুয়ারী

১৯০১)

অতএব প্রত্যেক সত্যিকার আহমদীর জন্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা আবশ্যক। রাসূলে করীম (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীর উপর অনুশীলন করা আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যেসব নির্দেশ প্রদান করেন বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর প্রতি আনুগত্য কর।

সম্মানিত সূধি! স্বভাবের নম্রতা, কোমলতা ও বিনয় তাক্বওয়ার সৌন্দর্যসমূহের মধ্য হতে এক অনন্য সৌন্দর্য। আত্মশ্লাঘা ও অহংকারের সাথে তাক্বওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বারংবার জামা'তকে এদিকে আহ্বান করেছেন, সর্বপ্রথম নিজ হৃদয়ে বিনয়, স্বচ্ছতা আর নিষ্ঠা সৃষ্টি করো আর সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকভাবে সহিষ্ণু, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিরহংকারী হয়ে যাও কেননা এটিই মূলতঃ সেই পথ যা গৃহীত হবার পথ আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং যেভাবে এর উপর আমল করেছেন তা প্রত্যেক আহমদীর জন্য পথ প্রদর্শক। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রা.) যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন আর তাঁর জীবদ্দশায় ঈমান আনেন নি তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় পিতা (আ.) কোন মোঘলের ন্যায় নয় দরিদ্রের মতো জীবন যাপন করেছেন।

এই বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কবিতার পঙক্তিতে বলেন:

'হে মাটির কীট! অহংকার ও অহমিকাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর

আত্মাভিমানী খোদাকেই অহংকার সাজে।

অহংকার ও অহমিকা পরিহার কর, কেননা এতেই খোদাভীতি নিহিত

মাটিতে মিশে যাও কেননা এতেই খোদার সন্তুষ্টি নিহিত।'

তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে খুবই মনোমুগ্ধকর। একদা তিনি (আ.) মসজিদে আকসা থেকে যোহরের নামায পড়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পিছন থেকে মীরা বখশী নামের একজন উম্মাদ ব্যক্তি ডাক দেয়, 'হে গোলামে আহমদ' তখনই তিনি দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, 'জ্বী' সে বলে, 'সালাম তো বলে যাও'। তিনি (আ.) বলেন, 'আসসালামু আলইকুম'। সে আবার বলে, 'কিছু দাও' তিনি (আ.) পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে যাতে চার অথবা আট আনা বাঁধা ছিল তা খুলে ওকে দিয়ে দেন।

তাঁর স্বভাব এমনই কোমল ও সাদাসিধে ছিল যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে কোনরূপ বৈষম্য করা পছন্দ করতেন না আর অধিকাংশ সময় বলতেন, **'মা আনা মিনাল মুতাকাল্লাফিনা'** (সূরা সাদ:৮৭)

অর্থাৎ আমি আমার সহযাত্রী ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে কোনরূপ ৭ কৃত্রিমতা পছন্দ করি না। এক অকৃত্রিম, সাদাসিধে আর বিনয়াবনত অবস্থা হুযূর (আ.)-এর জীবনে দেখা যায় আর এটিই একজন সত্যিকার আহমদীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

আর এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্যই অহোরাত্র চেষ্টা করতে থাকা উচিত।

আরো একটি ঘটনা মনে পড়েছে যা হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একবার মরহুম মুনশী অরোঢ়া সাহেব এবং আমি হুযূর (আ.)-এর খিদমতে কখনো কপুরথলা আসার জন্য অনুরোধ করি। সেসময় কপুরথলায় রেল যোগাযোগ ছিল না। হুযূর (আ.) প্রতিশ্রুতি দেন, আমি অবশ্যই কোন এক সময় আসবো। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই কোন সংবাদ না দিয়ে তিনি (আ.) একদিন কপুরথলা আসেন এবং এক্কা গাড়ী থেকে নেমে কপু রথলায় (আমাদের) বাড়ী সংলগ্ন ফাতাহ্‌ওয়ালী মসজিদে যান। হুযূর মসজিদের ইমামকে বলেন, মুনশী অরোঢ়া সাহেব অথবা মুনশী জাফর আহমদ সাহেবকে আমার আগমনের সংবাদ দিয়ে আস। মুনশী অরোঢ়া সাহেব এবং আমি কাচারীকে ছিলাম, ইমাম এসে জানায়, মির্যা সাহেব মসজিদে তশরীফ নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে সংবাদ দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। মুনশী অরোঢ়া সাহেব বিস্মিত হয়ে অত্যন্ত রাগের সাথে পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, 'তোর মসজিদে এসে মির্যা সাহেব অবস্থান করছেন, একথাও কি বিশ্বাসযোগ্য'? আমি বললাম, চলুন গিয়ে দেখা যাক। এরপর মুনশী সাহেব তৎক্ষণাত পাগড়ী বেঁধে আমার সাথে আসেন। মসজিদে গিয়ে দেখেন, মির্যা সাহেব মেঝেতে শুয়ে আছেন আর হাফেয হামেদ আলী সাহেব তাঁর পা টিপছেন, পাশে একটি পাত্র ও চামচ রাখা ছিল যা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি দুধ-রুটি খেয়েছেন। মুনশী অরোঢ়া সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর (আ.) এভাবে আসলেন? আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা কুরতারপুর স্টেশনে উপস্থিত থাকতাম। হুযূর (আ.) উত্তর দেন, সংবাদ দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করলাম।'

অতএব এই ছিল তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা যা মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে আর তাদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি অসাধারণ/অগাধ ভালভাসা সৃষ্টি করেছে।

এরপর বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে, দাম্পত্য কলহ আর মতবিরোধ। আর এসব বিবাদ-বিসম্বাদের মূল কারণ হচ্ছে সত্যিকার খোদাভীতির অভাব। যে কারণে আমিত্ব, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করা। আর অপরকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞার পাত্র জ্ঞান করা এবং অসহনশীলতার মত ব্যাধি জন্ম নেয়। যদি নম্রতা, বিনয় ও খোদাভীতির সাথে জীবন যাপন করা হয় আর সহিষ্ণুতাকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করা যায় তাহলে অনেক ভাঙ্গা সংসারও জোড়া লাগতে পারে। আর পারস্পরিক বিবাদের কারণে যেসব সন্তান বিনষ্ট হয়ে যায় তারা জামা'তের জন্য উপকারী/ কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হতে পারে। যদি বিশেষভাবে পুরুষরা কিছু সময় ধৈর্য ধারণ করে তাহলে এর ফলশ্রুতিতে মানুষের গৃহে যে শান্তি ও প্রশান্তি মিলে তা জীবনকে জান্নাত বানিয়ে দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন **অর্থাৎ যেভাবে নারীদের উপর পুরুষের কতক অধিকার রয়েছে অনুরূপভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের কতক অধিকার রয়েছে..... স্ত্রীদের সাথে স্বামীর এমন সম্পর্ক গড়া উচিত যেভাবে দু'জন বিশ্বস্ত ও সত্যিকার বন্ধুর সম্পর্ক হয়ে থাকে। মানুষের উন্নত আচার-আচরণ আর খোদা তাআলার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রথম সাক্ষী এই নারীরাই হয়ে থাকে। যদি তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না হয় তাহলে খোদা তাআলার সাথে সুসম্পর্ক হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'খাইরুকুম খাইরুকুম লে আহলিহী' তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম।'**

এছাড়া দাম্পত্য সম্পর্কের বরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃত শিক্ষা ও নির্দেশনা সমূহ উপেক্ষা করার কারণে বউ-শাশুড়ী, ননদ-ভাবীর বিরোধ কতক ঘরের শান্তিকে অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। অনেক ঘর ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, অসন্তোষ ও মনোমালিন্য দায়ী। এজন্য আহমদী পরিবারে এসব আত্মীয়-স্বজনদের সত্যিকার খোদাভীতি অবলম্বনের মাধ্যমে নম্রতা, ধৈর্য আর বিনয়কে নিজেদের জীবনের আবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত করা উচিত। সহনশীলতা এবং নম্রভাষার ব্যবহার ঘরকে জান্নাত বানিয়ে দেয় এবং তিক্ততার বিপরীতে নিরবতা অবলম্বন অনেক ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে দেয়।

বলা হয় যে, একজন বৌ তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কোন বুযূর্গের কাছে অভিযোগ করে, সেই বুযূর্গ তাকে একটি তাবীজ দিয়ে বলেন, যখনই তোমার শাশুড়ী তোমার সাথে ঝগড়া করে আর রূঢ় আচরণ করে তখন এই তাবীজকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখবে, আল্লাহ্ চাইলে এতে উপকার হবে। সুতরাং অল্প ক'দিনের মধ্যেই যখন শাশুড়ী দেখলো যে, বৌ কোন প্রতিউত্তর করছে না আর ঝগড়াসূলভ উত্তর দিচ্ছে না তখন তার মনেও নম্রতা সৃষ্টি হয় আর বৌয়ের সাথে তার ব্যবহার ভাল হয়ে যায় এবং তার সাথে ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। অতএব অল্প সময়ের ধৈর্য ও সহ্য আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর থেকে অনবরত খুতবা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জামা'তের তরবিয়তের উপর জোর দিচ্ছেন। কেননা যখন কোন জামা'ত প্রসার লাভ করে তখন তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতাও জন্ম নেয়। যেভাবে কোন সেনাবাহিনী বিস্তৃর্ণ এলাকা জয় করার পর এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যদি দূর্গ বা প্রাচীর নির্মাণ না করে, নিজেদের সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা না নেয় তাহলে তাদের বিজীত এলাকা পুনরায় হাতছাড়া হবার আশংকা থাকে। অতএব আমাদের প্রিয় ইমাম (আই.) এই সুরক্ষা দূর্গই নির্মাণ করছেন যাতে জামা'তের প্রসারকে সুনিশ্চিত করা যায় আর জামা'তের উন্নতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' অতএব আমাদেরকে সময়ের মূল্য অনুধাবন করে, যুগ ইমামের নির্দেশাবলীর উপর পুরোপুরি অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত আর সেসব গুণাবলী নিজের ভেতর সৃষ্টি করা উচিত যা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে সত্যিকার আহমদী বানানোর মত গুণ, আর সেসব নোংরামী সমূলে উৎপাটন করা উচিত যা আমাদের মর্যাদার জন্য হানীকর। আমরা তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহ অবলম্বনকারী হয়ে নিজ হৃদয়ে বিনয়, স্বচ্ছতা আর নিষ্ঠা সৃষ্টি করো আর সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকভাবে সহিষ্ণু, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিরহংকারী হয়ে যাও। আল্লাহ্ তাআলা কেবলমাত্র তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

পরিত্রাণ লাভে পবিত্র রমযানের শেষ দশক ও ইতিকাফ

মাহমুদ আহমদ সুমন

দেখতে দেখতে আমাদের মাঝ থেকে পবিত্র মাহে রমযানের রহমত ও মাগফিরাতের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে আর প্রবেশ করতে যাচ্ছি নাজাতের দশকে। রমযানকে বিদায় দিতে গিয়ে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের এমনটি হয়ে থাকতো যে আধ্যাত্মিক বসন্ত নিজের চমক দেখিয়ে যখন বিদায় নেয়ার ক্ষণে পৌঁছে যেত তখন তিনি (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন আর রমযানের কল্যাণরাজিতে নিজ ডালি ভরে নিতে কোন ত্রুটি করতেন না। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শেষ দশকের ইবাদত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি রমযানের শেষ দশকে প্রবেশ করলে তিনি (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন অর্থাৎ খুবই তৎপর হতেন এবং নিজ রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করতেন। সাথে সাথে তাঁর (সা.) পরিবার পরিজনকেও জাগাতেন (বুখারী, কিতাবুস্ সওম)।

শেষ দশকে হুযূর (সা.) ইতিকাফে বসতেন এবং লায়লাতুল ক্বদরের অন্বেষণে রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জাগিয়ে রাখতেন। ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বা অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় 'ইবাদতের সংকল্প নিয়ে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ' (হিদায়া, বাবুল ইতিকাফ)। রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফে বসা সুন্নতসম্মত। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর (সা.) পবিত্র স্ত্রীগণও এ সুন্নতের অনুসরণ করতেন (সহি মুসলিম, কিতাবুল ইতিকাফ)। হুযূর (সা.) রমযান মাসে ১০ দিনই ইতিকাফে বসতেন। উলেখ্য, হযরত নবী করীম (সা.) জীবনের শেষ রমযানে ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন।

২০শে রমযান ফজরের নামাযের পর ইতিকাফ আরম্ভ করা উচিত। এজন্যে ১৯শে রমযান বাদ মাগরিব ই'তিকাফস্থলে এসে যাওয়াই অনেকে ভাল মনে করে থাকেন। ইতিকাফে বসে মুতাকিফরা একাগ্রচিত্তে ব্যক্তিগত দোয়া ছাড়াও সবার জন্য সময়োপযোগী দোয়া করেন।

ইতিকাফের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো জামে মসজিদ। এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমে উলেখ রয়েছে- **ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ** অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ইতেকাফ কর (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াতাংশ)। হাদীসেও নির্দেশ এসেছে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন **লা ই'তিকাফা ইল্লা ফিল মাসজিদুল জামে'** অর্থাৎ জামে মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই। (আবুদাউদ, কিতাবুল ইতিকাফ পৃঃ ৩৩৫)। ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ইতিকাফ যে কোন মসজিদে বা অপারগতার কারণে মসজিদের বাইরেও ইতিকাফ হতে পারে। মহিলারা ঘরে নামাযের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে সেখানে ইতিকাফে বসা তাদের জন্য উত্তম (হিদায়া, বাবুল ই'তিকাফ, পৃষ্ঠা ১৯০)।

ইতিকাফকারী দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন তিনি তাঁর অভীষ্ট মনোবাসনা পূর্ণ করে তবে ইতিকাফ থেকে উঠতে পারেন। এটা কঠিন সাধানার বিষয়। তাই মুতাকিফকে এমন কোন কাজকর্ম বা আচার আচরণ করা উচিত নয় যাতে তার এ সাধনা ব্যহত হয় বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় অথবা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় বা তার মনোবাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন তাপস সাধনের ন্যায় একাগ্রতা ঐকান্তিকতা শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার লাগাম যেন হাত ছাড়া হতে না দেন।

রমযানের এই শেষ দশকের একটি রাতে এসে থাকে লায়লাতুল ক্বদর। পবিত্র কুরআন হাদীসে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে উল্লেখ আছে কিন্তু শবে বরাতের কোন শিক্ষা কুরআন হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। লায়লাতুল ক্বদর বা সৌভাগ্য রজনী লাভ বোধ করি মু'মিনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তিরূপে দৈত্যকে নিধন করার পর মু'মিনের কাছে আসে সেই মুহূর্তটি-সেই পাওয়ার মুহূর্তটি যা আল কুরআনের সূরা ক্বাদরে 'লায়লাতুল কদর' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ মুহূর্তটি। হাজার মাস অর্থাৎ প্রায় ৮০ বছর। একজন মু'মিন সাধারণত ৮০ বছর বেঁচে থাকেন। সুতরাং তার সারা জীবনের সাধনার ফল লাভের মুহূর্তটি তার গোটা জীবনের চেয়েও কদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার।

লায়লাতুল ক্বদর বলতে আমরা সাধারণত একটি রাতকে মনে করে থাকি। ভৌগলিক কারণে সারা দুনিয়ায় যেহেতু একই সময়ে রাত থাকে না সেজন্যে লায়লাতুল কদরকে আমাদের গণনার একটি রাত নির্ধারণ করা সঠিক বলে মনে হয় না। লাইলাতুল ক্বদর এমন একটি সময় মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় তথা মিলাতী জীবনে রাতের ন্যায় কাজ করে থাকে। মু'মিন সাধনার শেষ লগ্নে তার প্রভুর দিদার বা দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে বাক্যালাপে ভূষিত হয়। এ মুহূর্তটিই আসলে তার জীবনে লায়লাতুল ক্বদর। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ মুহূর্তটি অবশ্যই মু'মিনের জীবনে আসে রমযানের কঠোর সাধানার শেষ দশকে। রোযার সাধনার মাধ্যমে মু'মিন পানাহার ত্যাগ করে, নিদ্রাকে কম করে দিয়ে এবং নিজের প্রজননকে সাময়িকভাবে হলেও স্বীকার করে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়। তাই সে আল্লাহ্‌র সাথে নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

হাদীস পাঠে জানা যায় হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-হযরত রাসূল করীম (সা.) ক্বদরের রাত্রি সম্বন্ধে বলেছেন 'রমযান মাসের শেষের দশ রাত্রিসমূহে লায়লাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান কর' (বুখারী)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন ' তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। রমযান মোবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরজ করেছেন। এ মাসে বেহেশতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত' (বুখারী)। হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি লায়লাতুল ক্বদর লাভ করলে কি করবো? হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বললেন– **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী। মার্জানাকে তুমি ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে মার্জনা কর (তিরমিযী)।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে অনেকের ধারণা যে লায়লাতুল কদরের রাত বলতে ২৭ রমযানকে বুঝায়। তাই এই রাতেই সবাই খুব বেশী ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। আর বাকী রাতগুলোতে তেমন ইবাদত করতে দেখা যায় না। ২৭ রমযানের রাতই যে লায়লাতুল ক্বদরের রাত আসলে এই বিশ্বাসটি ঠিক নয়। রাসূল করীম (সা.)-এর হাদীস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি লায়লাতুল ক্বদর রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর যে কোন একটি রাত। তাই আমাদেরকে এই শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লায়লাতুল ক্বদরের অন্বেষণ করতে হবে। আর রমযান মাসের শেষ দিনগুলোতে আমাদের সবার বেশি বেশি উপরোক্ত দোয়াটি করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে নাজাত দান করুন, আমীন।

লেখক : মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ
masumon83@yahoo.com

সকল প্রকারের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পাবার ঢাল হল রোযা

মওলানা জাফর আহমদ

রোযা সম্পর্কে জানার ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমাদেরকে এটা জানা আবশ্যক যে, রোযা কি আর এ ইবাদতের মাঝে কি নিহীত রয়েছে?! রোযার জন্য আরবী 'সওম' শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা বা নিজেকে সংযত রাখা। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক রোযা হচ্ছে সুবেহ সাদেকের পূর্ব থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং বেশীর ভাগ সময় যিকরে এলাহীতে রত থাকা। অর্থাৎ এই রোযা যেন কেবল ইবাদতের নিয়্যতেই করা হয়। অনুরূপভাবে বৃর্থা কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকা। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি সকল যুগেই রোযার বিধান ছিল আর এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বৃটানিকা লিখেছে এমন কোন ধর্ম নাই যাতে রোযার নির্দেশের কথা পাওয়া যায় না। বরং প্রতিটি ধর্মেই রোযার নির্দেশ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে গিয়েছিলেন তো সেখানে চল্লিশ দিনরাত রোযা রেখেছেন।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর হাওয়ারীদেরও রোযার আদব সম্পর্কে নসিহত করেছেন। আঁ-হযরত (সা.)–এর আবির্ভাবের পূর্বেও মক্কার লোকেরা রোযা রাখত। তিনি (সা.) মদীনায় হিজরতের পর জানতে পারেন ইহুদীরাও রোযা রাখে। এভাবে মিশরীয়দের মাঝেও রোযার প্রচলন ছিল। গ্রীকরা রোযা রাখতো এবং হিন্দু ধর্মে উপবাস ব্রত প্রচলনের ব্যবস্থা আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকাতে লিখিত আছে সভ্যতার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায়ের নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মেই উপবাসের (রোযার) প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য একমাত্র ইসলাম ধর্মই রোযার নিয়ম কানুন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে নির্দেশ দিয়েছে এবং একে এক স্থায়ী নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে। তিনি (সা.) একবার জিজ্ঞেস করলেন, তারা ১০ই মহররমে কেন রোযা রাখে । ইহুদীরা জবাব দেয় ১০ই মহররম হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত হন তাই আমরা এ দিন রোযা রাখি। হযরত রাসূল করীম (সা.) রোযা ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এ রোযা রাখতেন এবং তার অনুসরীদেরও রাখার নির্দেশ প্রদান করতেন। এরপর যখন রমযানের রোযা ফরয হয় তারপর আর এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয়া হয়নি। (বুখারী)

রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর।" (সূরা বাকারা : ১৮৪)

এই আয়াতে করীমার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই যে, শুধু ইসলাম ধর্মেই রোযা পালনের হুকুম দেয়া হয়নি। বরং ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্মেও রোযা পালনের রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। তবে হা একথা সত্য যে, ইসলাম ধর্মে পালিত রোযা হচ্ছে পরিপূর্ণ রূপ। রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা শারিরীক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতাসমূহ ও অসুস্থতা থেকে বাঁচো। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযা অবস্থায় না কোন যৌন উত্তেজক কথা বলবে আর না অজ্ঞদের ন্যায় কোন কাজ করবে। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া বা গালমন্দ করে তাহলে সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী)

এই হাদীসের এটাই উদ্দেশ্য যে, রোযা মানুষকে সকল প্রকারের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ কাজ করে। অন্য হাদীসে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, হযরত উসমান বিন আবুল আস (রা.) বর্ণিত আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, রোযা আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ঢাল স্বরূপ। সেই ঢালের ন্যায় যা তোমাদেরকে শত্রুর যে কোন ধরনের আক্রমণ থেকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। (ইবনে মাজাহ)

আরো বর্ণনায় এসেছে, রোযা আগুন থেকে ও যুগের বিপদাবলী থেকে এবং ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য ঢাল স্বরূপ। রোযা খোদার আযাব থেকে বঁচানোর জন্য ঢাল স্বরূপ। (জামে আস সাগীর)

মোটকথা যে ব্যক্তি রোযার পরিপূর্ণ হেফাযত করে এবং পরিপূর্ণ শর্তসাপেক্ষে এই ইবাদত করে তার জন্যই কেবল এই রোযা তার আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবেলায় ঢাল স্বরূপ কাজ করবে। এই ঢাল রোযাদারের নিকট বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে সে যেন এটা ব্যবহার করে। আর এই হাদীসে এটার পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, কোন মন্দ খেয়ালের বা কথার সময় অথবা ঝগড়ার সময় রোযার ঢালকে কাজে লাগাও এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বল এই মন্দসমূহে আমি নিপতিত হব না। আমি এই ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকব। কেননা আমি রোযাদার। যদি মানুষ এভাবে এই ঢালকে ব্যবহার করে তাহলে না সে কেবল দুনিয়াবী বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে বরং শারিরীক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকেও তাকে এই রোযা নিরাপদ রাখবে। বরং এটার ফলে সে দোযখের আগুন থেকেও নিরাপদ থাকবে। আর তা সর্বদার জন্য মানুষের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে। এটা কত বরকত ও মঙ্গলময় ঢাল। হায়! যদি সকল মুসলমান এই ঢাল লাভ করত। এক হাদীসে এটাও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না যে যেন রোযা রাখে কেননা রোযা তাকে সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করবে।

রমযানের নাম 'রমযান' এ কারণে রাখা হয়েছে যে, এটা পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। কেননা 'রময' শব্দের অর্থ উত্তাপ ও জ্বলনকে বুঝায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "রমযান সূর্যের তাপকে বলা হয়। কেননা রমযানে যেহেতু মানুষ সকল প্রকারের মানসিক ও দৈহিক কামনা বাসনা থেকে ধৈর্য ধারণ করে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে নিজের মধ্যে একটি উত্তাপ ও

উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উত্তাপ ও জ্বলন মিলে রমযান হয়েছে। ব্যাকরণ বিদগণ বলেছেন, এই মাস যেহেতু গরমের সময় এসেছে তাই তাকে রমযান বলা হয়। আমার মতে এটি সঠিক নয়। কেননা রমযান কেবলমাত্র বিশেষভাবে আরবের জন্য হতে পারে না। আধ্যাত্মিক উত্তাপের মানে হচ্ছে আধ্যাত্মিক ধর্মের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও উত্তাপের নাম। রমযান ঐ সকল বিষয়কেও বলে যা দ্বারা পাথর ও অন্যান্য বস্তু গরম হয়।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলেন, এক ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা যা তার পরিবার পরিজন, ধন সম্পদ ও প্রতিবেশির কারণে সৃষ্টি হয়। নামায, রোযা ও সদকা সেটার কাফফারা হয়ে যায় (বুখারী)।

অত:পর রোযা শারিরীক রোগেরও ব্যবস্থাপত্র। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুকে পবিত্র করার জন্য সেটির একটি যাকাত রয়েছে। আর শারিরীক (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) যাকাত ও পবিত্রতার মাধ্যম হচ্ছে রোযা। (ইবনে মাজাহ) অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, তোমরা রোযা রাখ তাহলে সুস্থ থাকবে। (জামে আস সাগীর)

সৈয়দনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, "রোযা অসংখ্য প্রকার রোগ মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। বর্তমানে পরীক্ষা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়, মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মাঝে মেদের সৃষ্টি হয় যা তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এ সকল লোকের জন্য রোজা খুবই উপকারী (তফসীর সূরা ফাতিহা)

সূফীগণ বলেন, তাসাওউফের প্রাণ হচ্ছে কম খাওয়া, কম কথা বলা, ও কম শয়ন করা। রমযান মাস এই তাসাউফের মূল বিষয়টি নিজের মাঝে বহন করে। হযরত আকদাস (আ.) রোযার দর্শনের ব্যাপারে বলেন, "অল্প আহার করা ও ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মার সংশোধনের জন্য আবশ্যকীয়। এর বদৌলতে সত্য স্বপ্নের শক্তি সামর্থ্য লাভ হয়। মানুষ কেবল রুটির মাধ্যমে জীবিত থাকে না। বরং চিরস্থায়ী জীবনকে ছেড়ে দেয়া মানে খোদার ক্রোধকে নিজের উপর আপতিত করা। (বক্তব্য জলসা সালানা ১৯০৬)

তিনি (আ.) আরো বলেন,

"হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে দৈহিক রুটি খেয়েছে কিন্তু সে আধ্যাত্মিক খাবারের কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। দুনিয়াবী রুটি যেভাবে দেহকে শক্তিশালী করে অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক খাবার আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এভাবে রূহানীয়ত শক্তি দ্রুততর হয়। খোদা থেকে যদি সিক্ত হতে চাও তাহলে জেনে নাও সমস্ত দরজা তার শক্তিতেই খুলে। রোযা আত্মার সংশোধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, 'লায়াল্লাহুম ইয়ার শুদুন' জানা যায় যে, এই মাসের সঠিক পথের সাথেও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেটির মাধ্যম হচ্ছে খোদার প্রতি ঈমান ও তার হুকুম সমূহের অনুসরণ এবং দোয়াকে আখ্যা দেয়। আর এ সকল বিষয়ই এমন যা দ্বারা খোদার নৈকট্য লাভ হয়।

হযরত সাহেবজাদা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, "প্রত্যেক রমযানুল মোবারকে মানুষের যে কোন একটি মন্দ যেভাবেই হোক পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করা উচিত। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রমযানের মত বরকতমন্ডিত মাসে কোন মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করা অন্যান্য দিনের চেয়ে অধিক সহজ হবে। রমযানে এরূপ বরকতমন্ডিত অঙ্গীকার পূরণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাই মানুষ যেন দোয়ার মাধ্যমে এই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে রমযানের গুরুত্ব বুঝার ও অবশিষ্ট রোযাগুলো সঠিকভাবে রাখার তৌফিক দান করুন, (আমীন)।

লেখক : শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

* আমাদের একমাত্র ছেলে আবদুল মালিক শোভন ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে (পরীক্ষা ২০১১) এইচ এস সি বিজ্ঞান বিভাগ GPA-5 (Golden A+) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে পাস করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, তার SSC পরীক্ষার ফলাফলও GPA-5 (Golden A+) ছিল। তার এই উত্তম ফলাফলের জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলার খাস রহমত, আত্মীয় স্বজনদের দোয়া ও তার ঐকান্তিক চেষ্টা এবং তার মা মোবারেকা বেগম, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল হান্নান ও একমাত্র বোন হাদিয়া আফরিন মিলি'র সহযোগিতার ভূমিকাই ছিল মুখ্য। সে যেন ভবিষ্যতে আরও উত্তম ফলাফল করতে পারে সে জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট পরিবারের পক্ষ থেকে খাসভাবে দোয়ার আবেদন রইল।

পিতা-**মোহাম্মদ আবদুল হান্নান**

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার আনসারুল্লাহ্‌র সদস্য জনাব মোহাম্মদ নূরজ্জামান এর প্রথম মেয়ে মরিয়ম সিদ্দিকা (ইভা) ২০১১ সনের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় সরকারী মেমোরিয়াল কলেজ, খুলনা থেকে হিসাব বিজ্ঞান জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।
সে একজন ওয়াকফে নও সন্তান। সে খুলনা জামা'তের একজন প্রবীন আহমদী এবং ১৯৯৯ সালে খুলনার মসজিদে বোমা হামলায় নিহত শহীদ মমতাজ উদ্দীনের বড় পুত্রের প্রথম সন্তান। তার রূহানী উন্নতি, উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

এন এ শাহীন আহমদ

দোয়ার আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব ডা: আব্দুর রশীদ গত কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থতার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছেন এবং বর্তমান চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি দীর্ঘদিন তেজগাঁও জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ফাইনান্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা আমাদের পিতার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর জন্য জামা'তের সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পরিবারের পক্ষে: **আবদুস সালাম**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
তেজগাঁও

রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর

এনামুল হক রনী

মাহে রমযান এমন একটি কল্যাণ বিতরণের মাস যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। কারণ এ মাসে কুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন, 'রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কুরআন মানবজাতির জন্য এক মহান হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) (সূরা বাকারা : ১৮৬)।

এই আয়াত থেকে রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। আর এ কারণে রমযান মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস, আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের মাস।

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আর এটি (রমযান) এমন একটি মাস যার প্রথম ভাগে আল্লাহ্‌র রহমত, দ্বিতীয় ভাগে গুনাহ সমূহের মাগফিরাত আর শেষ ভাগে আসে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত বা মুক্তি লাভ। (মিশকাত শরীফ)

প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই নাজাত বা মুক্তি লাভ করার মন-মানসিকতা নিয়ে পবিত্র মাহে রমযানে প্রবেশ করেন আর সবাই চায় তার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। অর্থাৎ পরম স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য লাভ করে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে নবজাত শিশুর ন্যায় নব জীবন লাভ করে। প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণবিশ্বাস ও সওয়াব লাভের প্রত্যাশা নিয়ে রমযানে রোযা রাখেন তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ রমযান এর রোযা একজন বান্দাকে নিষ্পাপ জীবন লাভের সুযোগ করে দেয়।

রমযানের শেষ দশক

পবিত্র মাহে রমযানের শেষ দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক। হাদীস শরীফে এ দশককে নাজাত বা মুক্তি লাভের দশক বলা হয়েছে। অপরদিকে এদশককে পরিপূর্ণ ইবাদতের দশক বলা হয়েছে। এ দশকেই আল্লাহ্ তাআলার বান্দারা তাঁর বেশি বেশি নৈকট্য লাভ করার জন্য ইতেকাফ করে, নফল ইবাদতে জোর দেয়, লায়লাতুল ক্বদরের সন্ধানে থাকে। হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'সৎ কর্মশীলতার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রমযানের শেষ দশকের চেয়ে মহৎ ও প্রিয় আর কোন দিন নেই' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড)। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, 'রমযানের শেষ দশক শুরু হলে রাসূলে করীম (সা.) সারারাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকে জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশি সাধনা ও পরিশ্রম করতেন (বুখারী ও মুসলিম)। যেহেতু রমযানের শেষ দশকের প্রতিটি মুহূর্ত বান্দা ও তাঁর স্রষ্টার মাঝে গভীর সম্পর্কে এগিয়ে যেতে থাকে তাই খোদা অত্যন্ত নিকটে এসে যায়। আর বান্দার চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হয়।

এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল) নিশ্চয় আমি তাদের নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (সূরা বাকারা : ১৮৭) খোদাও তাঁর এত নিকট হয় যে, দোয়ার উত্তর দেয়। এতায়াতে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর প্রদত্ত দায়িত্বাবলী যথাযথ ভাবে পালন করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শেষ দশকে ইতেকাফ

পবিত্র রমযানের শেষ দশকে বেশি বেশি ইবাদতে আত্মমগ্ন হওয়ার একটি মোক্ষম সুযোগ ইতেকাফ করা। পবিত্র রমযানের ইতেকাফ মসজিদে করার শিক্ষা রয়েছে। রমযানের শেষ দশ দিন মহানবী (সা.) ইতেকাফ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) অপর একটি হাদীসে হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সা.) ২০তম রমযানের ফজরের নামাযের পর ইতেকাফে বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)। অর্থাৎ রমযানের ২০ তারিখে নামাযের সময় মসজিদে ইতেকাফে আসতে বলা হয়েছে।

ইতেকাফের গুরুত্ব বুঝতে নিম্নের হাদীসটি একজন মু'মিনের জন্য যথেষ্ট, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ নবী (সা.)-কে মৃত্যু দান করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিয়মিতভাবে রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। তাঁর (সা.)-এর পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ইতেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত রাসূলে করীম (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ এই আমলকে ধরে রাখা। আর রমযানের ২০তম দিবসের ফজরে ইতেকাফে বসে যাওয়া। আর নীরবে নিভৃতে বসে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে মশগুল হওয়া, কুরআন পাঠ করা, আস্তাগফার করা। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের না হওয়া। বেশি বেশি নফল ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া বিশেষ করে রাতকে জাগরুক রাখা। এমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা একজন মুতাফিকিন কে স্রষ্টার নৈকট্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। তাই আমাদের সকলের এই শেষ দশকের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো উচিত।

শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর

মাহে রমযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষ দশক যেমন তেমনি এ দশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো–'লায়লাতুল ক্বদর'। একজন মু'মিন বান্দা সারা জীবন ব্যাপী সাধনা করে যে সওয়াব বা পূণ্য লাভ করে থাকে। লায়লাতুল ক্বদর লাভ করলে তার চেয়ে বেশি সওয়াব প্রাপ্ত হন। তাই লায়লাতুল ক্বদর লাভের প্রত্যাশা প্রত্যেকের করা উচিত। আর প্রত্যেকে এমন আশা করে থাকে। পবিত্র কুরআনে সূরা 'কদরে'-'লায়লাতুল ক্বদর' সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে : নিশ্চয় আমরা এ (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, ক্বদরের রাত কি? 'ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (সূরা ক্বদর : ২-৪)

এই রাতের মর্যাদার কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলতেন, 'তোমরা শেষ দশদিন রাতে লায়লাতুল ক্বদরের সন্ধান কর। (বুখারী ও মুসলিম) হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'রমযানের শেষ দশ রাতের বিজোড়

রাতগুলোতে শবে ক্বদরের সন্ধান কর। (বুখারী শরীফ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজনকে রমযানের শেষ সাত রাতের সপ্নের মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর দেখানো হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে ঐক্যমত সাধিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরের সন্ধান করতে চায় এই শেষ সাত রাতের মধ্যে তার অন্বেষণ করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)।

এই সকল হাদীসের বর্ণনা থেকে আমাদের লায়লাতুল ক্বদরের সন্ধান শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলিতে করা উচিত। লায়লাতুল ক্বদর লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। যদি কেউ লাভ করে সে ধন্য। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, যদি আমি জানতে পারি এটিই লায়লাতুল ক্বদরের রাত তা হলে কি করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তখন এই দোয়া কর, **'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফ্‌উয়া ফাফু আন্নী'** অর্থা : হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ কর সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী শরীফ) আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে লায়লাতুল ক্বদরের সন্ধানে সহায়তা দিন।

লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, তিনি (আ.) বলেছেন, 'প্রত্যেক যুগে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার সময় আকাশ থেকে আলো অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। .....খোদা তাআলা সূরা ক্বদরে বলেছেন, বরং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর বাণী ও তাঁর নবীকে 'লায়লাতুল ক্বদরে' আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ লায়লাতুল ক্বদরেই অবতীর্ণ হন। তোমরা কি বুঝ লায়লাতুল ক্বদর কি? লায়লাতুল ক্বদর সেই অন্ধকার যুগের নাম যার অন্ধকার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়।

এইজন্য সেই যুগ অন্ধকার দূর করার জন্য স্বাভাবিকভাবে এক জ্যোতি অবতীর্ণ হওয়ার তাকিদ দিয়ে সেই যুগের নাম রূপকভাবে লায়লাতুল ক্বদর রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাত নয়। তা এক যুগের নাম, যা আঁধারের দরুন রাতের তুল্য। নবীর মৃত্যু বা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মৃত্যুর পর যখন হাজার মাস গত হয়ে যায়, যা মানবীয় আয়ুর যুগকে প্রায় শেষ করে দেয় এবং মানবীয় হুস-অনুভূতির বিদায়ের সংবাদ দেয় তখন এ রাত নিজ রূপ দেখাতে আরম্ভ করে এবং গেড়ে বসে। তখন স্বর্গীয় কার্যক্রমে এক বা একাধিক সংস্কারকের বীজ গোপনে বপন করা হয় যাঁরা নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে প্রকাশিত হবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত থাকে। একথার প্রতি ইঙ্গিত করে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন, (সূরা কদর) যে ব্যক্তি এ লায়লাতুল ক্বদরের জ্যোতিঃ দেখেছে এবং যুগ সংস্কারকের সাহচার্যের সম্মান লাভ করেছে, সেই আশি বছরের বৃদ্ধের চাইতে উত্তম, যে এ জ্যোতির্ময় যুগ পায়নি। যদি এ সময়ের এক মুহূর্তও কেউ লাভ করে তবে এ এক মুহূর্ত পূর্ববর্তী হাজার মাস থেকেও উত্তম। কেন উত্তম? কারণ লায়লাতুল ক্বদরে খোদা তাআলার ফিরিশ্‌তা ও রূহুল কুদুস মহামান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেই সংস্কারকের সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন। (ফতেহ ইসলাম পুস্তক থেকে)

প্রিয় পাঠক! আমরা লায়লাতুল ক্বদরের প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা জানলাম। আমাদেরকে যুগ ইমামের সংস্পর্শে তাঁর নির্দেশনাবলী যথাযথ পালন করে ফায়দা হাসিল করা উচিত। আর রমযান মাসে এ সুযোগ বেশি বেশি কাজে লাগানো উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াব লাভের আশায় ইবাদত করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়। (বুখারী শরীফ)

আমাদের সকলের উচিত রমযানের সকল নির্দেশ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা। কোন প্রকারের ইবাদত থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না থাকি। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে মাহে রমযানের বেশি বেশি কল্যাণ লাভের মাধ্যমে সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ জীবন লাভের তৌফিক দিন। আমীন, সুম্মাআমীন।

লেখক : মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

নবীনদের পাতা–

দোয়া কবুলিয়তের কতিপয় ঘটনাবলী

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

আল কুরআনুল আযীমে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাকে তাঁর নিকট দোয়া করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করেছেন, যেমন তিনি এক স্থানে বলেছেন, উদ্‌উনী আসতাজীবলাকুম অর্থাৎ আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দোয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিসের জন্যেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার দোয়াপ্রার্থী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর, এমনকি জুতার ফিতার জন্যও।"

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, "তিনি (আল্লাহ্) সে সকল লোককে ভালবাসেন যারা দোয়া করেন। কেননা দোয়া ইবাদত। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "উদ্‌উনী আসতাজীবলাকুম" দোয়া কর আমি কবুল করব। আর আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ইবাদতের মগজ এবং মূল হচ্ছে দোয়া।" (লেকচার লুধিয়ানা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, "দোয়া কী? আল্লাহ্ এবং তাঁর নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণমূলক ইতিবাচক সম্পর্কের অপরনাম দোয়া। আল্লাহ্‌র করুণা ও কল্যাণ বান্দাকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করে। বান্দা যতই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে তাতে সাড়া দেয়, আল্লাহ্ ততই তার আরো নিকটে আসেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এমন এক গুণ ধারণ করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।" (বারাকাতুদ্‌দোয়া)

মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আজ একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে আর তা হলো আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করা। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রীতি এটিই ছিলো। যখন তাঁকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করত বা কোন সমস্যায় পড়তেন সাথে সাথেই তিনি ভালভাবে অযু করতেন আর দু' রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দুঃখ-কষ্ট, সমস্যাকে দূর করে দিতেন। আল্লাহ্ তাআলা যে তাঁর বান্দার আকুতি মিনতি শোনেন সে সম্পর্কে কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি।

** আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম

খলীফা হাজীউল হারামাইন হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) একবার এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন অথবা ঐ ব্যক্তি তাঁর (রা.) কাছে আমানত রেখে ছিলেন। যাই হোক, পাওনা দার আসলো টাকা নেওয়ার জন্য। ঐ সময় তিনি নামায পড়ার জন্য অযু করছিলেন। তাকে বলা হল নামাযের পর এসে তোমার পাওনা নিয়ে যেও। খলীফা আউয়ালের (রা.) একজন শিষ্য তাঁর পকেট খুব ভালভাবে চেক করে দেখলেন যে, পকেটে একটি পয়সাও নেই। শিষ্য মনে মনে ভাবলেন আজ দেখব তিনি কিভাবে টাকা পরিশোধ করেন। আল্লাহ্ তাআলার আচরণ দেখুন, নামাযের পর পকেটে হাত দিয়ে পাওনাদারের সব টাকা পরিশোধ করে দিলেন। অথচ পকেটে পূর্বে একটি পয়সাও ছিল না।

** আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) একবার ইংল্যান্ডে সফর করছিলেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলো এক ইংরেজ, আর সেই ইংরেজ ছিলো বশির আহমদ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সেক্রেটারী সাহেব তাঁকে (রা.)-কে বললেন, আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা নেই যাতে করে সফর জারি রাখতে পারবো। এখন সফর বন্ধ করা উচিত। তিনি (রা.) বললেন, কোন অসুবিধা নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সেক্রেটারী সাহেব অবাক হলেন এই অচেনা দেশে কিভাবে ব্যবস্থা হবে? এখানে কেউ তাঁকে চিনেও না। তিনি (রা.) তখনই আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। অচেনা দেশ হলে কি হবে আমাদের খোদা তো আর অচেনা নন। ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি Saint Saint বলে ডাকছিলো। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা! আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা! বলে তাঁর কাছে আসলো এবং একটি চেক তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললো আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। এই আপনার উপহার। এই চেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ছিলো।

** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবরাহীম বাকাপুরী (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার একবার অপারেশন হয়েছিলো। ডাক্তারের অবহেলার কারণে অপারেশনের পর ভিতরে একটি অঙ্গ ঠিক জায়গায় বসানো হয়নি। এর জন্য আমার খুব কষ্ট হত, কেউ একজন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব আমাকে ঔষধপত্র দিলেন। ঔষধ খাওয়ার ফলে নড়ে যাওয়া অঙ্গটি ঠিক জায়গায় বসে পড়ল। কিন্তু কষ্ট রয়েই গেল। এত কষ্ট হত যে আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমার চোখ থেকে অজস্র ধারায় পানি পড়ত। আমি ভাবতাম এভাবে চোখ থেকে পানি ঝরলে না জানি আবার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। কষ্টের কারণে আমার মনে হত দেয়ালে মাথা ঠুকরাই। এমতাবস্থায়, আমার দোয়ার কথা মনে পড়ল। আমি আমার কষ্টের কথা আল্লাহ্ তাআলাকে জানালাম। তারপর একটি দেয়ালেই একটি লেখা দেখতে পেলাম 'আসলেম' অর্থাৎ তুমি নিরাপদ হও, সেই থেকে আমার চোখও ভাল আছে এবং আমার সব কষ্টও দূর হয়ে গেছে।

** হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) তিনি হিন্দুস্তান থেকে ইংল্যান্ডে যান। ইংল্যান্ডে কাজ শেষ করে তিনি আমেরিকার দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। আমেরিকায় যেতে হলে মেডিকেল রিপোর্ট অবশ্যই দরকার। না হলে সেদেশে প্রবেশ অসম্ভব। তাঁর চোখে মারাত্মক সমস্যা ছিল। এজন্য তাঁর মেডিকেল রিপোর্ট ভাল হওয়ার কোন সম্ভব নেই। তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে গভীরভাবে দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌র কি মহিমা, কোন পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়াই ডাক্তার সাহেব তাঁকে সুন্দর ও ভাল একটি রিপোর্ট দিয়ে দিলেন। কোন ঝামেলা ছাড়াই তিনি আমেরিকায় প্রবেশ করলেন।

** হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব যখন ছোট ছিলেন সেই সময়কার একটি ঘটনা। ছোট বেলা থেকেই আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। একদিন স্কুলে মাষ্টার সাহেব পড়া দিলেন। পড়াটি ছিল খুবই কঠিন। আর পড়া না দিতে পাড়লে সমস্যা হবে। এই ভেবে তিনি স্কুলে যাওয়ার আগে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আজ আমি স্কুলের এই পড়া মুখস্ত করতে পারিনি। আর পড়া না দিতে পারলে সমস্যা হবে, তুমি এমন অবস্থার সৃষ্টি কর যেন মাষ্টার সাহেব আজ আমার থেকে পড়া না ধরেন। স্কুলে তাই ঘটল। সবার কাছ থেকে পড়া আদায় হয়ে গেছে। এখন তাঁর পালা। শিক্ষক তাঁর কাছে আসলেন পড়া নিতে। কি মনে করে তিনি বললেন, থাক আজ তোমাকে পড়া দিতে হবে না।

** হযরত মীর ইসমাঈল সাহেব (রা.) চাকুরী করার সময় অনেক টাকা ঋণী হয়ে পড়লেন। ঋণের কারণে তিনি সব সময় টেনশনে থাকতেন। তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট অনেক দোয়া করলেন। তিনি বলেছেন, আমি এত আবেগের সাথে দোয়া করলাম যে আমার মনে হল আমার এই দোয়া এখনই কবুল হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, দোয়া করার পর আমার পয়ত্রিশটি বছর কেটে গেল। আমি এই পয়ত্রিশ বছরে কখনও ঋণগ্রস্থ হইনি।

** দোয়া কবুলিয়তের আরেকটি ঘটনা। এক ব্যক্তি বাটালা থেকে জিনিসপত্র কিনে আশপাশের গ্রামগুলোতে বিক্রি করতেন। তাঁর একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। কেউ দুষ্টামি করে বা শত্রুতামি করে তাঁর ঘোড়ার বাঁধন খুলে দেয়, তিনি আশেপাশের গ্রামগুলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথাও পাওয়া গেল না। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাদিয়ানে ফিরে এসে হযরত আম্মাজানকে ঘটনা খুলে বললেন আর দোয়া করতে বললেন। হযরত আম্মাজান একটি কাগজে দোয়া লিখে দিলেন এবং বললেন, তুমিও এই দোয়াটি পড়। আল্লাহ্‌র কি আশ্চর্য ব্যবহার! ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি শুধু লঙ্গরখানার নিকটে গেলাম আর দেখতে পেলাম আমার ঘোড়া আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমরা সবাই বিশ্বাস করি সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি হচ্ছেন ওয়াহেদ ও লা শরীক। যদিও তিনি সবার খোদা। কিন্তু তারপরও প্রত্যেকের একজন নিজস্ব খোদা আছেন, তিনি এক হলেও তাঁর জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করে, তখন তার জন্য তিনি এক নতুন খোদা হয়ে যান এবং নতুনরূপে তার সঙ্গে আচরণ করেন।

আমরা যখন সমস্যায় পড়ি তখন একে অন্যকে দোয়ার জন্য আবেদন করে থাকি। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ কার দোয়া কবুল করবেন তিনিই ভাল জানেন। মহান খোদা তাআলা সব জানেন সব দেখেন। তিনি আমাদের সবচাইতে বেশি আপন। তাই এই মহান খোদার কাছেই আমাদের সব সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ আমাদের বেশি বেশি দোয়া করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক: মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

সংবাদ

ক্রোড়া জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৭/২০১১ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় জেরে তবলীগসহ মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং জলসা শেষে একজন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এতে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব আশিকুর রহমান সোহেল ও এনামুল হক ইন্টু। জলসায় বক্তৃতা করেন সর্বজনাব নাজির হোসেন ভূইয়া, আসাদুজ্জামান ভূইয়া, শরীফ আহমদ চৌধুরী, এনামুল হক ইন্টু ও মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এনামুল হক

খুলনা লাজনা ইমাইল্লাহর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৭/২০১১ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমান আরা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। জলসার কার্যক্রমের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সভানেত্রী।

নযম পেশ করেন জাভীন মোবারেকা (ঐশী)। সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় বক্তব্য রাখেন রোকসানা মঞ্জুর, রেহেনা জাফর এবং সভানেত্রী দীনা নাসরিন। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে ১৯ জন লাজনা ও নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০৭/২০১১ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন দিলরুবা বেগম মায়া, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র হতে আগত ইসরাত জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। আরও উপস্থিত ছিলেন আমাতুল মতিন নাসেরা ও সাদেকা রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মরিয়ম বেগম কবিতা।

ইজতেমায়ী দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করান সভানেত্রী। অত:পর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মঈন উদ্দিন আহমদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ফারহানা চৌধুরী। তারপর কেন্দ্র হতে আগত সদর সাহেবা প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি মাকসুদা রহমান এবং আমাতুল মতিন নাসেরা ইজতেমায় উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এ ছাড়াও স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাগণ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর ভাষণের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ১৮তম ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ১১০ জন লাজনা এবং ৬৬ জন নাসেরাত ও শিশু উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

সারা বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের ৪৫তম সালানা জলসা এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার

ফতুল্লা

ফতুল্লা জামা'তে এ বছর যুক্তরাজ্যের ৪৫তম জলসা এমটিএ-এর মাধ্যমে ৬টি বাসায় ও মসজিদে দেখানোর সুব্যবস্থা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ৩ দিনের এই জলসা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে দর্শকমন্ডলীগণ উপভোগ করেছেন। এই জলসায় গড়ে প্রতিদিন ৫৫ জন করে দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মোট ১৩ জন মেহমান যোগদান করেছেন। আগত মেহমানদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এমটিএ-এর অনুষ্ঠান দেখে তাদের মধ্যে ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

তেজগাঁও

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর জামে মসজিদ ও ২৫টি এমটিএ সংযোগের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে লন্ডনের ৪৫তম সালানা জলসা সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। জলসার প্রায় সব অনুষ্ঠানই তেজগাঁও জামা'তের প্রায় সকল আহমদী দেখেছেন। এছাড়া জলসার তিন দিনই বেশ কয়েকজন মেহমানও জলসার বক্তৃতাসমূহ সরাসরি দেখেন। মেহমানগণ জলসার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

আলহাজ্জ কায়সার আলম

ঘাটুরা জামা'তে আরো দু'টি ডিশ স্থাপন

গত ২২/০৭/২০১১ শুক্রবার uk. সালানা জলসাকে সামনে রেখে আরো দুটি ডিশ স্থাপন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ডিশ দু'টির উদ্বোধন করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমান লস্কর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট এস, এম, ইব্রাহীম ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. এনামুল হক রনী। এছাড়াও জামা'তের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দসহ স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাশেদ লস্কর

তেজগাঁও জামা'তে লাইব্রেরী উদ্বোধন

গত ২৯ জুলাই রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আব্দুর রশীদ সাহেব-এর দোয়ার মাধ্যমে তেজগাঁও জামা'তের লাইব্রেরীর উদ্বোধন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। লাইব্রেরী উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে আরজী ও তালিমুল কুরআন জনাব ফজল-ই-ইলাহী, তেজগাঁও জামা'তের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল ওয়াদুদ, জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ কায়সার আলম, সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব আবদুস সালাম এবং মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমনসহ জামা'তের সদস্য বৃন্দ। লাইব্রেরীতে আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তকসহ বাইরের বিভিন্ন লেখকদের বই-পুস্তকও রাখা হয়। সবাইকে এই লাইব্রেরী থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

আলহাজ্জ কায়সার আলম

ঢাকায় দায়ী ইলাল্লাহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৮/২০১১ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব ঢাকা দাঈ ইলাল্লাহর উদ্যোগে মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, (মোবাল্লেগ ইনচার্জ)-এর সভাপতিত্বে দারুত তবলীগ লাইব্রেরীকক্ষে ৩য় দাঈ ইলাল্লাহ্ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন সারওয়ার হোসেন দুলাল। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ন্যাশনাল অডিটর, ফজল-ই-ইলাহী, ওয়াকফে আরজী ও তালিমুল কুরআন। সম্মেলনে হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা ও দাঈ ইলাল্লাহদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং দাঈ ইলাল্লাহদের আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সবশেষে তবলীগ সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন-এর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ

নূরনগরে আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর ইশ্বরদীতে আতফাল দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান এর সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের আহমদ। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ঘাটুরায় তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০৭/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব জনাব এস, এম, হাবিবউল্লাহর বাড়িতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমান লস্কর এর সভাপতিত্বে তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সজীব আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম ইরফান। বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। কুরআনের দরস প্রদান করেন জনাব এস, এম, হাবিবউল্লাহ। তারপর সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। উক্ত তালিম তরবিয়তী সভায় ৫৬ জন সদস্য /সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মজিবুর রহমান লস্কর

চরসিন্দুর লাজনা ইমাইল্লাহর ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই রোজ শুক্রবার ৩য় বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, কুইজসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। সকাল ৯-৩০ মি: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমায় ২০ জন লাজনা নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হেসেবে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম তরবিয়ত এবং সেক্রেটারী তাজনীদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

রিপা মাহমুদ

তারুয়ার মধ্যপাড়া হালকায় তালিমী সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৭/২০১১ তারিখ মধ্যপাড়া হালকায় জনাব বিনয় আমীনের বাসায় মাসিক তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শামসু মিয়া।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন অন্তর আহমদ, উর্দু নযম পেশ করেন সামির আহমদ, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব খলিল আহমদ, জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, জনাব মাসুদ কুরাইশী, জনাব ছাব্বির আহমদ ও স্থানীয় মোয়াল্লেম। এতে উপস্থিত ছিলেন ৬৫ জন।

শামসু মিয়া

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান গত ০৬/০৭/২০১১ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে, ২ মেয়ে, ৬ নাতি, ৯ নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। মরহুমকে মাহিগঞ্জ জামা'তের কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুম একজন নিবেদিত আহমদী খাদেম ছিলেন। নামাযী ছিলেন এবং নিয়মিত বেদারী করতেন। তিনি ছিলেন সকলের শুভাকাঙ্খী ও পরিচিত মুখ।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্থানীয় জামা'তের জন্য ১ লক্ষ টাকা ওয়াদা করে যান। উল্লেখ থাকে যে তার পিতা মরহুম আব্দুল হেকীম (রূপা মিয়া) তারুয়া জামা'ত থেকে অত্র জামা'তে পরিবারসহ হিজরত করে আসেন ও এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম দান করুন এবং তার পরিবারবর্গকে সাবরে জামিল প্রদান করুন তার জন্য সকলের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
মরহুমের মেঝো ছেলে

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ
http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মুল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী , ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 3rd Issue

The Fortnightly Ahmadi

15 August 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com